ইউনিট
৩

ব্যবস্থাপনার নব্য ধ্রুপদী মতবাদ
Neo-Classical Therory of Management

ভূমিকা

ধ্রুপদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা-ই হলো নব্যধ্রুপদী মতবাদ। এটি ধ্রুপদী মতবাদেরই বর্ধিত রূপ এবং এর ধরন ধ্রুপদী মতবাদের ঠিক বিপরীত। নব্য-ধ্রুপদী মতবাদে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা না করে মানবীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ যন্ত্র নয়, সে একজন মানুষ, সামাজিক জীব। অতএব তাকে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে- এটিই এ তত্ত্বের মূল কথা। তাদের আবেগ-অনুভূতি, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। এ মতবাদে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ মতবাদে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে- এলটন মেয়ো, হুগো মানস্টারবার্গ, এফ,জে রয়েথলিজ বার্জার, উইলিয়াম জে, ডিকশন, রেনসিস লাইকার্ট, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, হার্জবার্গ, হার্বার্ট সাইমন প্রমুখ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৩.১:	নব্যধ্রুবদী তত্ত্বের ধারণা; বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত; নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ; এ তত্ত্বের সমালোচনা
পাঠ-৩.২:	আচরণের ধারণা; আচরণের বৈশিষ্ট্য; মৌলিক দিকসমূহ; ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ
পাঠ-৩.৩:	আচরণের কারণ তত্ত্বের মৌলিক মডেল; একই কারণে আচরণের ভিন্নতা; একই আচরণের ভিন্ন ভিন্ন কারণ, আচরণ পরিবর্তনের উপায়
পাঠ-৩.৪:	কে, লিউইনের আচরণ মডেল; সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ
পাঠ-৩.৫:	দলের সংজ্ঞা; দলের কাজ; দলের সুবিধা; দলের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.৬:	দলের জীবনচক্র বা দল গঠনের স্তরসমূহ; একজন সদস্য দলে কেন যোগ দেয়; দলের দুর্বলতা; দলকে কীভাবে কার্যকর করা যায়
পাঠ-৩.৭:	দলের প্রকারভেদ; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের পার্থক্য
পাঠ-৩.৮:	দলীয় কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ; হর্থন গবেষণা

পাঠ-৩.১ নব্যধ্রুবদী তত্ত্বের ধারণা; বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত; নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ; এ তত্ত্বের সমালোচনা

Concept of Neo-classical Theory; Features or Assumptions of the Neo-classical Theory, Important Elements of Neo-classical Theory; Crtiticism of Neo-classical Theory

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- নব্যধ্রুবদী তত্ত্বের ধারণা পাবেন;
- নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত বলতে পারবেন;
- এ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- এ তত্ত্বের সমালোচনা করতে পারবেন।

নব্য-ধ্রুবদী তত্ত্বের ধারণা

Concept of Non-classical Theory

নব্য ধ্রুপদী মতবাদ ধ্রুপদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বলা যায়, এটি ধ্রুপদী মতবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ এবং ঠিক বিপরীত। ধ্রুপদী মতবাদে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে বিশ্বাস করে এবং মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো, কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং আবেগকে বিবেচনা করে। এ মতবাদের মূল ধারণা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনা করে। এর আর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা না করে সামাজিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে। নব্য ধ্রুপদী মতবাদ অস্থিতিস্থাপক প্রকৃতির এবং এতে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় সংযোজিত রয়েছে; যেমন: সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সামাজিক ও শিল্প মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এলটন মেয়ো (Elton Mayo), হুগো মানস্টারবার্গ (Hugo Munsterberg), এফ, জে, রয়েথলিজ বার্জার (F. J. Rothlis berger) উইলিয়াম জে, ডিকসন (William J. Dickson), হেনরি, এল, গ্যান্ট (Henry L. Gantt), ভিলট্রেবো পেরেটটো (Viltrevo Pareto), রেনসিস লাইকার্ট (Rensis Likert), ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor), ক্রিস আরজেরিস (Chris Argyrls), হার্জবার্গ (Herzberg), হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon), জেমস মার্চ (James Merch) ও মেরি পার্কারফলেট (Mary Parker Follett) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অবদান রেখেছেন।

নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত

Features or Assumptions of the Neo-classical Theory

নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে মানুষকে যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা না করে সামাজিক জীব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ তত্ত্বে কতিপয় পৃথক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ গুলো নিম্নরূপ:

১. **সামাজিক পদ্ধতি (Social System):** নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে সংগঠনকে বিভিন্ন বিভাগসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। এ তত্ত্বে কর্মীদের মানবিক দিকগুলো বিবেচনা করা হয়।

২. **সমন্বয়সাধন (Coordination):** এ তত্ত্বে কখনোই কর্মীদের যন্ত্রের সাথে তুলনা করা হয় না। তাই মানবিক মূল্যবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। ফলে কর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব নিরসন হয় এবং সাংগঠনিক লক্ষ্যের সাথে কর্মীর লক্ষ্যকে সমন্বয় করা সহজ হয়।

৩. **অনানুষ্ঠানিকতার অস্তিত্ব (Informal Existence):** এ তত্ত্বে অনেক কিছুই অনানুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সংগঠনের উপর অনানুষ্ঠানিক সংগঠন প্রভাব বিস্তার করে।

৪. **পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব (Affect of Environment):** নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার অবস্থা কর্মীদের কাজের উপর প্রভাব ফেলে এবং সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করে সাংগঠনিক কার্যাবলি সম্পাদনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৫. **আচরণ অনুমোদন (Assumption of Behavior):** ব্যবস্থাপনা হচ্ছে মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। এ তত্ত্বে তাই কর্মীদের আচরণ সামাজিক উপাদানসমূহের দ্বারা অনুমান করা যায়।

১. **প্রেষণাদান (Motivation):**এ তত্ত্বে কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করার হাতিয়ার হিসাবে প্রেষণা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে কর্মীরা দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়।

৭. **দলগত কার্যসম্পাদন (Group Performance):** নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে সংগঠনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দলগতভাবে কার্যসম্পাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৮. **নৈর্ব্যক্তিকতার নীতি অনুসরণ (Following Impersonal Policy):** এ তত্ত্বে কর্মীদেরকে আদেশ ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিতার নীতি অর্থাৎ কারো প্রতি কোনো বৈরী আচরণ প্রদর্শন না করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৯. **তথ্যের অবাধ বিনিময় (Available for Information System):** এ তত্ত্বে তথ্যের অবাধ বিনিময়ের সুবিধা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়। এভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টি মানব সম্পর্ক মতবাদের একটি আবশ্যিক ধারণা হিসাবে পরিগণিত।

১০. **সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science):** এ তত্ত্ব অস্থিতিস্থাপক প্রকৃতির এবং এতে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় সংযোজিত হয়েছে। যেমন: সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যে, নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনার নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ

Important Elements of Neo-classical Theory

“People should understand people”. অর্থাৎ, মানুষ মানুষকে বুঝা উচিত। নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ অনানুষ্ঠানিক দলের উপর ভিত্তি করে কতিপয় উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। নীচে এ সকল উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. **প্রেষণা (Motivation):** সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মীদের কতিপয় অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার কৌশলকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার তত্ত্বসমূহ হলো মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব, হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, ম্যাকগ্রেগরের এক্স এবং ওয়াই তত্ত্ব, ভ্রুমের প্রত্যাশা তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য।

২. **তত্ত্বাবধানের ধরন (Style of Supervision):** নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে সাংগঠনিক লক্ষ্যার্জনের জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধানের ধরনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ তত্ত্বে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্যাটার্ন অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। নেতৃত্বের ধরন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রেনসিস লাইকার্টের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **সংগঠনের প্রকৃতি (Nature of Organization):** এ তত্ত্বে সংগঠনের প্রকৃতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সংগঠনে কার্যসম্পাদনে অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। **Chris Argyris** তার “Personality and Organization” গ্রন্থে এমন এক ধরনের সংগঠনের কথা বলেছেন যেখানে কর্মীগণ একদিকে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এবং অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনেও অবদান রাখতে পারবে।

৪. **ব্যক্তিক পার্থক্য (Individual Deference):** এ তত্ত্বে ব্যক্তিক পার্থক্যের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Keith Davis বলেন, “Each person is different from all others.” অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সকলের চেয়ে পৃথক। এ তত্ত্বে সাংগঠনিক কার্যসম্পাদনে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য মানবিক উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। হুগো মনস্টারবার্গের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫. **দলীয় গতিশীলতা (Group Dynamism):** দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় গতিশীলতার ধারণাটি বিশেষজ্ঞদেরকে আকৃষ্ট করে। দলীয় গতিশীলতা হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন শক্তির পর্যালোচনা। দেখা যায়, দলীয় গতিশীলতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা অপরিসীম যা হথর্ন গবেষণায় প্রমাণিত।

সুতরাং বলা যায় যে, নব্যধ্রুপদী তত্ত্বে উপর্যুক্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান। এ তত্ত্বে কর্মীদের সামাজিক ও মানবিক দিকগুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলটন মেয়ো এর হথর্ন গবেষণা মানুষ সম্পর্কে অর্থনৈতিক ধারণার পরিবর্তে সামাজিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে।

নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের সমালোচনা

Crtiticism of Neo-classical Theory

ধ্রুপদী মতবাদের ত্রুটিসমূহ দূর করার লক্ষ্যেই উদ্ভাবিত হয় নব্যধ্রুপদী (Neo-classical) তত্ত্ব বা মতবাদ। এ মতবাদে মানুষকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে সামাজিক মানুষ হিসাবে গণ্য করার ধারণা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। তবুও এ মতবাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। নীচে নব্যধ্রুপদী মতবাদের সমালোচনাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **সর্বজনীন সাংগঠনিক কাঠামো (Universal Organization Stucture):** নব্যধ্রুপদী মতবাদে যে একটি সর্বোত্তম সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এতে সাংগঠনিক কাঠামো নকশার পারিপার্শ্বিক, কারিগরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি।

২. **প্রেষণার ক্ষেত্রে অনার্থিক উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ (Emphasis on non-financial incentive):** নব্যধ্রুপদী মতবাদে প্রেষণার ক্ষেত্রে অনার্থিক উপাদানের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উপাদান দ্বারাও প্রেষিত করা যায়। তাই এ তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. **সমন্বয়সাধন (Coordination):** এ তত্ত্বে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দলগত কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।

৪. **কার্যসন্তুষ্টি (Job Satisfaction):** এ মতবাদে কার্যসন্তুষ্টির জন্য সামাজিক চাহিদা পূরণ ও স্বীকৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংগঠনে কাজের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ধরনের অভাব বা প্রয়োজন পূরণ করতে চায়। এ মতবাদে কর্মীদের জৈবিক চাহিদা এবং আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি বিষয় অবজ্ঞা করা হয়েছে।

৫. **সম্প্রসারিত আকার (Developed Size):** সমালোচকদের মতে, ধ্রুপদী মতবাদের সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ। তাই স্বতন্ত্র মতবাদ হিসাবে এ মতবাদকে কেউ স্বীকার করতে চায় না।

৬. **মানবিক উপাদানে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ (More Emphasis on Human Factors):** এ তত্ত্বের প্রবক্তারা মানবিক উপাদানের উপর অতিমাত্রার গুরুত্বারোপ করেন। এতে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সংগঠনে বিশৃংখলা হওয়ার আশংকা থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ তত্ত্বের সম্প্রসারিত রূপমাত্র। তাই এ মতবাদ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনার পক্ষে অনেক সময় সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন করা সবসময় সহজ হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদানসমূহ ও এর দুর্বল দিক সম্পর্কে খাতায় লিখুন এবং নিজের জ্ঞান যাচাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ

ধ্রুপদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা-ই হলো নব্যধ্রুপদী মতবাদ। এটি ধ্রুপদী মতবাদেরই বর্ধিত রূপ এবং এর ধরন ধ্রুপদী মতবাদের ঠিক বিপরীত। নব্যধ্রুপদী মতবাদে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা না করে মানবীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যন্ত্র নয়, সে একজন মানুষ, সামাজিক জীব। অতএব তাকে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে- এটিই এ তত্ত্বের মূল কথা। তাদের আবেগ-অনুভূতি, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। এ মতবাদে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ মতবাদে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে- এলটন মেয়ো, হুগো মানস্টারবার্গ, এফ,জে রয়েথলিজ বার্জার, উইলিয়াম জে, ডিকশন, রেনসিস লাইকার্ট, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, হার্জবার্গ, হার্বার্ট সাইমন প্রমুখ। এ তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হলো- কর্মীদের দলগত কাজের প্রতি জোর দেওয়া। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দলগতভাবে কার্যসম্পাদন করবে। এতে কর্মীরা প্রণোদিত হয় এবং দলীয় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তবে এ তত্ত্বের দুর্বল দিক হলো- এতে অনার্থিক প্রেষণার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন কার্যদলকে সমন্বয় করা কঠিন।

পাঠ-৩.২ আচরণের ধারণা; আচরণের বৈশিষ্ট্য; মৌলিক দিকসমূহ; ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ

Concept of Behavior; Characteristics of Behavior; Basic Aspects of Human Behavior; Determinants of Individual Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আচরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- আচরণের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন;
- আচরণের মৌলিক দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ জানতে পারবেন।

আচরণ: সংজ্ঞা ও ধারণা

Behavior : Definition and Concept

মানুষ ও প্রাণীর গতিশীলতা বা কর্মচঞ্চলতার মূলে রয়েছে তার আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট আচরণ করে এবং আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়। সহজ অর্থে আচরণ বলতে মানুষের দর্শনীয় সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে বুঝায়। যেমন: মানুষ কথা বলে, হাঁটা চলা করে, হাত নাড়ে, খাবার খায়, চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে ইত্যাদি। এ কাজগুলো বাইরে থেকে চোখে পড়ে বলেই এগুলো আচরণ নামে পরিচিত। আবার, মানুষের এমন কিছু কাজ রয়েছে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, যেমন: প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের অভ্যন্তরীণ এসব কার্যকলাপও আচরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানীরা আচরণকে Overt এবং Covert এ দুভাগে বিভক্ত করেছেন। Overt আচরণ হচ্ছে প্রকাশিত যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান বা বাহ্যিক। অপরপক্ষে, Covert আচরণ হচ্ছে লুকায়িত বা অভ্যন্তরীণ আচরণ।

মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণকে উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক রূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো যখনই মানুষ কোনো উদ্দীপকের মুখোমুখি হয় তখন সে সাড়া দেয়। তার এ সাড়া প্রদানকে প্রতিক্রিয়া বলে। প্রতিক্রিয়া মানুষকে নির্দিষ্ট কর্মে প্রভাবিত করে। সুতরাং উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আন্ত:ক্রিয়াকে আচরণ বলা যায়। মনোবিজ্ঞানী ল্যুইন আচরণের একটি গাণিতিক সমীকরণ দিয়েছেন।

তার মতে, **B= f(PxE)**

এখানে,

B হলো Behavior বা আচরণ

f হলো Function বা কার্যকলাপ

P হলো Person বা ব্যক্তি

E হলো Environment বা পরিবেশ

এ সূত্রের আলোকে বলা যায় আচরণ হচ্ছে পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির কার্যকলাপের সমষ্টি।

R. F. Maier এর মতে, “মানুষের আচরণ সর্বদাই দুটো বিষয়ের ফলাফল - একটি হলো তার ব্যক্তিগত প্রকৃতি, অন্যটি হলো পরিস্থিতির প্রকৃতি।”

সুতরাং বলা যায় যে, কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে মানুষ বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ যেসব কাজকর্ম করে তাকে আচরণ বলে।

আচরণের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Behavior

মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

১. মানুষের আচরণ হচ্ছে, উত্তেজনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকর্ম। অর্থাৎ উত্তেজনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে আচরণের উৎপত্তি হয়।

২. মানুষের আচরণ নির্দিষ্ট কারণ ও শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন: কাজের পরিবেশ, বয়স, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

৩. মানব আচরণের নেপথ্যে কোনো না কোনো অভিপ্রায় লুকায়িত থাকে। কারণ ছাড়া যেমন আচরণ হয় না, তেমনি অভিপ্রায় ছাড়াও আচরণ হয় না।

৪. আচরণের সাথে লক্ষ্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ, ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংঘটিত হয়। লক্ষ্য অর্জিত হলে আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫. আচরণকে বাহ্যিক দিক থেকে প্রত্যক্ষণ করা যায়। কারণ ব্যক্তির দৃশ্যমান কার্যকলাপই হচ্ছে তার আচরণ।

৬. ব্যক্তির আচরণ দৃশ্যমান হলেও এমন কিছু অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্ম রয়েছে যেগুলো বাইরে থেকে দেখা যায় না। চিন্তা ও কল্পনার অদৃশ্য বিষয়গুলো তাই আচরণ হিসাবে গণ্য হয়।

৭. মানুষের নির্দিষ্ট আচরণের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণের প্রভাব থাকে, তেমনি একই কারণেও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে।

৮. মানুষের আচরণ চিরস্থায়ী কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন উপাদান বা চলকের পরিবর্তনের সাথে সাথে আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে।

৯. মানুষের আচরণ কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় যাকে Sequence বলে। এ Sequence গুলো Stimulus বা উদ্দীপক, Organism বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, Behavior বা আচরণ এবং Accomplishment বা কার্যসম্পাদন।

মানব আচরণের মৌলিক দিকসমূহ
Basic Aspects of Human Behavior

মানুষের আচরণ অধ্যয়ন করা সত্যিই কঠিন। তবুও আচরণ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ আচরণের রহস্য ও প্রকৃতি উন্মোচনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের সেই প্রচেষ্টায় ব্যক্তি আচরণের বহু মৌলিক বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো হলো:

এক নজরে মানব আচরণের মৌলিক দিকসমূহ

সমন্বিত কার্যকলাপ	শিক্ষালব্ধ বিষয়	দ্বিমুখী পরিচয়	কারণের উপস্থিতি
লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া	নির্দিষ্ট অনুক্রম	পরবর্তী আচরণ	একই কারণ, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ
ভিন্ন ভিন্ন কারণ, একই আচরণ	আচরণ পরিবর্তন	নিজস্ব মূল্যবোধ দিয়ে মূল্যায়ন	বহুমুখী উপাদানের প্রভাব

১. **সমন্বিত কার্যকলাপ (Integrated Action):** ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বিত কার্যকলাপের ফলই হলো ব্যক্তি আচরণ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই ব্যক্তি আচরণে লিপ্ত হয়।

২. **শিক্ষালব্ধ বিষয় (Learned Subject):** মানব আচরণ একটি শিক্ষালব্ধ বিষয়। ব্যক্তি যেমন শেখে তেমনই আচরণ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই এ শিক্ষা গ্রহণ করে।

৩. **দ্বিমুখী পরিচয় (Two-fold identity):**মানব আচরণের মধ্যে দ্বিমুখী রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে বাহ্যিক আচরণ (Overt Behavior) এবং অন্যটি অভ্যন্তরীণ আচরণ (Covert Behavior)। মানুষ যখন আচরণ করে, তখন তার কারণ হিসাবে যেমন: বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব থাকতে পারে, তেমনি অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে।

৪. **কারণের উপস্থিতি (Presence of cause):**মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে এর পেছনে কোনো না কোনো কারণের উপস্থিতি লক্ষ্য যায়। কেননা, সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া বাস্তবে কেউ কোনো প্রকার আচরণ করে না।

৫. **লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া (Goal Oriented Process):** মানুষের প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জড়িত থাকে। কারণ ছাড়া যেমন মানুষ আচরণ করে না, তেমনি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়াও আচরণ করে না। প্রকৃতপক্ষে আচরণের দ্বারা মানুষ লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়।

৬. **নির্দিষ্ট অনুক্রম (Definite Sequence):** আচরণের কারণতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের আচরণ নির্দিষ্ট অনুক্রম বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। এই অনুক্রমটি হচ্ছে উদ্দীপক (Stimulus), দেহী বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (Organism), আচরণ (Behavior) এবং কার্যসম্পাদন (Accomplishment)।

৭. **পরবর্তী আচরণ (Next Course of Behavior):** মানুষের একটি আচরণের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর পরবর্তী কোনো নতুন আচরণের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আচরণের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে আচরণ একেবারে শেষ হয়ে যায় না, পরবর্তীকালে নতুন কোনো আচরণের উদ্ভব হয়।

৮. **একই কারণ, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ (Same Cause, Different Behavior):**একই কারণ জড়িত থাকলেও বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- খেলায় পরাজিত হয়ে একপক্ষ যেমন বিমর্ষ হয়, অপরপক্ষ তেমনি উল্লাস প্রকাশ করে।

৯. **ভিন্ন ভিন্ন কারণ, একই আচরণ (Different Cause, Same Behavior):** একই কারণে মানুষের আচরণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কারণ জড়িত থাকলেও মানুষ একই আচরণ করতে পারে। দু:সংবাদ পেয়ে কেউ যেমন কাঁদতে পারে, তেমনি সুসংবাদ পেয়েও মানুষ আবেগে কাঁদতে পারে।

১০. **আচরণ পরিবর্তন (Change of Behavior):** পরিবেশ বা ব্যক্তি কিংবা উভয়ের পরিবর্তন সাধনের দ্বারা মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। মানুষ যে কারণে বিশেষ কোনো আচরণ করে, সেই কারণ দূর করে অথবা ব্যক্তির কাছে বিষয়ের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার আচরণ পরিবর্তন করা যায়।

১১. **নিজস্ব মূল্যবোধ দিয়ে মূল্যায়ন (Evaluation by own value):** মানুষ তার প্রতিটি আচরণকে নিজস্ব মূল্যবোধের দ্বারা মূল্যায়ন করে। ব্যবস্থাপনা শ্রমিক আন্দোলনকে যেভাবে মূল্যায়ন করে, শ্রমিকদেরকে তাদের আন্দোলন অন্যভাবে মূল্যায়ন করতে দেখা যায়। মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

১২. **বহুমুখী উপাদানের প্রভাব (Influence of Multi-fold Factors):** মানুষের আচরণে বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো বংশগত, পারিবারিক, সামাজিক, পরিবেশগত, শিক্ষালব্ধ, ব্যক্তিগত, শারীরিক, সাংগঠনিক ইত্যাদি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় মানুষের আচরণের মৌলিক দিকগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এগুলোর ভিত্তিতে মানব আচরণের জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Individual Behavior
অথবা, আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
Factors of Influencing individual Behavior

মানুষের আচরণ বিভিন্ন প্রকার উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ এ উপাদানগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করেছেন। তাদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে উপাদানগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

ক. ব্যক্তিক উপাদান;
খ. সামাজিক উপাদান;
গ. পরিবেশগত উপাদান।

নিম্নে এ উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. ব্যক্তিক উপাদান (Individual Factors) : আচরণের ব্যক্তিক উপাদানগুলো হলো:

১. মনোভাব (Attitude): ব্যক্তির আচরণে তার মনোভাবের প্রভাব থাকবেই। মনোভাব হচ্ছে এক ধরনের মানসিক প্রবণতা যা ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে।

২. প্রত্যক্ষ (Perception): প্রত্যক্ষণ হলো মানুষের এমন একটি ক্ষমতা, যার দ্বারা সে বাইরের জগতের বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেয়। এ প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা মানুষের আচরণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

৩. শিক্ষা (Education): আচরণের উপর ব্যক্তির শিক্ষার প্রভাবও অনস্বীকার্য। শিক্ষার স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবার ফলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের আচরণ করে।

৪. অভিজ্ঞতা (Experience): মানুষের আচরণের নেপথ্যে তার অতীত অভিজ্ঞতাও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কারণ তার সামনে অতীতের যে অভিজ্ঞতা থাকে সে অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তার বর্তমান আচরণ নির্ধারিত হয়।

৫. বয়স (Age): ব্যক্তির বয়স নি:সন্দেহে তার আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই বিভিন্ন বয়সের মানুষের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো একটি বিষয়ে বয়স্ক মানুষ যে আচরণ করে, শিশু বা তরুন সে আচরণ করে না।

৬. দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characterstics): মানুষের আচরণের উপর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন: দৈহিক গঠন, উচ্চতা, দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রবণশক্তি, ওজন, আকৃতি ইত্যাদি।

৭. লিঙ্গ (Sex): লিঙ্গের পার্থক্যের কারণেও ব্যক্তির আচরণ তারতম্যমূলক হয়ে থাকে। সাধারণভাবে পুরুষরা যত পরিশ্রমী হয় মহিলারা ততা পরিশ্রমী হয় না। তাদের চাহিদা, প্রেষণা, মনোভাব, কর্মকৌশল ইত্যাদিও পার্থক্যমূলক হয়।

৮. বুদ্ধিমত্তা (Intelligence): বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার মানসিক যোগ্যতা। মানুষ তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ করে তার ফলেই তার আচরণ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের ফলে প্রতিটি মানুষের আচরণে পার্থক্য দেখা যায়।

৯. পারিবারিক পরিবেশ (Family Environment): মানুষের আচরণের উপর পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পারিবারিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণে শিশুরা শান্ত, উদ্ভ্রান্ত, জেদী, মারমুখী, আপসমনা কিংবা আগ্রাসী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

১০. সাংস্কৃতিক পটভূমি (Cultural Background): মানুষ যে সমাজে বসবাস করে, সে সমাজের মধ্যে অনেক রীতি-নীতি, প্রথা, অভ্যাস, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি থাকে। এগুলো সবাইকে মেনে চলতে হয়। এসব চলকের প্রভাবে তাই আচরণও পার্থক্যমূলক হয়।

খ. সামাজিক উপাদান (Social Factors): কোনো আচরণের পিছনে সামাজিক উপাদানসমূহের প্রভাবও লক্ষণীয়। ব্যক্তি যে সমাজে বসবাস করে, সেখানকার জীবন প্রণালী, সামাজিক মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা, জীবন প্রণালীর ধারা ও স্তর, সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদি ব্যক্তি আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

গ. পরিবেশগত উপাদান (Environmental Factors): ব্যক্তির আচরণ পরিবেশগত উপাদানের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এ উপাদানগুলো ব্যষ্টিক এবং সমষ্টিক উভয়ই হতে পারে। ব্যক্তি যে সংগঠনে কাজ করে সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, কাজের পরিবেশ, নিয়ম-নীতি, কার্যপদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ইত্যাদি তার আচরণের গতিধারা নির্ণয় করে। এগুলো ব্যষ্টিক উপাদান। অনুরূপভাবে, প্রতিষ্ঠানের বাইরের জগতের বেশ কিছু উপাদানও তার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা, সরকারি নীতি ও নিয়ম, বিভিন্ন প্রকার আইন, শ্রম সম্পর্ক, ইত্যাদি। এগুলো সামষ্টিক উপাদান।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যক্তির আচরণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় কিংবা এটি দৈবক্রমেও সৃষ্টি হয় না। এর পেছনে ব্যক্তি, সামাজিক এবং পরিবেশগত বহু উপাদান জড়িত থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ আচরণের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, মৌলিক দিকসমূহ ও ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ উপাদান লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ ও প্রাণীর গতিশীলতা বা কর্মচঞ্চলতার মূলে রয়েছে তার আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট আচরণ করে এবং আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়। সহজ অর্থে আচরণ বলতে মানুষের দর্শনীয় সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে বুঝায়। যেমন: মানুষ কথা বলে, হাঁটা চলা করে, হাত নাড়ে, খাবার খায়, চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে ইত্যাদি। এ কাজগুলো বাইরে থেকে চোখে পড়ে বলেই এগুলো আচরণ নামে পরিচিত। আবার, এমন কিছু কাজ রয়েছে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, যেমন: প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের অভ্যন্তরীণ এসব কার্যকলাপ ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানীরা আচরণকে Overt এবং Covert এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। Overt আচরণ হচ্ছে প্রকাশিত যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান বা বাহ্যিক। অপরপক্ষে, Covert আচরণ হচ্ছে লুকায়িত বা অভ্যন্তরীণ আচরণ। আচরণের অনেকগুলো মৌলিক দিক রয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বিত কার্যের ফলই হলো ব্যক্তি আচরণ। আচরণ একটি শিক্ষালব্ধ বিষয়। মানুষ দু'ধরনের আচরণ করে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। মানুষ যে-কোনো কারণে আচরণ করে। আচরণের চারটি পর্যায় রয়েছে, যেমন: উদ্দীপক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আচরণ ও কার্যসম্পাদন। ব্যক্তিক আচরণ নির্ধারণের তিনটি বিষয় রয়েছে, যেমন: ব্যক্তিক উপাদান, সামাজিক ও পরিবেশগত উপাদানসমূহ।

পাঠ-৩.৩ আচরণের কারণ তত্ত্বের মৌলিক মডেল; একই কারণে আচরণের ভিন্নতা; একই আচরণের ভিন্ন ভিন্ন কারণ; আচরণ পরিবর্তনের উপায়

Basic Model of the Causation of Behavior; The Same Cause May Result into Differenct Behavior; The Same Behavior May have Differenct Causes; Ways or Techniques to Change Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আচরণের কারণ তত্ত্বের মৌলিক মডেল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আচরণের ভিন্নতার কারণ বলতে পারবেন;
- আচরণ পরিবর্তনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

আচরণের কারণ তত্ত্বের মৌলিক মডেল

Basic Model of the Causation of Behavior

উত্তেজকের প্রতি সাড়া দেওয়া প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ যখনই কোনো উত্তেজকের মুখোমুখি হয়, তখন স্নায়ুতন্ত্রে এর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং দেহগত অনুভূতিগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তেজকের সাথে দেহগত প্রভাবের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া দেখায়। এ প্রতিক্রিয়ার পরিপূর্ণ রূপই হলো আচরণ।

মনোবিজ্ঞানীরা আচরণের উৎস এবং এর পরিসমাপ্তির বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং তারা পর্যালোচনার ফলাফলকে একটি মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ মডেলটি 'SOBA' মডেল নামে পরিচিত। নীচে একটি চিত্রের সাহায্যে মডেলটি উপস্থাপন করা হলো:

S	→	O	→	B	→	A
উদ্দীপক পরিস্থিতি		অঙ্গপ্রত্যঙ্গ		আচরণ		কার্যসম্পাদন

আচরণের কার্যকারণ সম্পর্কিত মডেলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে আচরণের চারটি অনুক্রম বা পর্যায় (Sequence) রয়েছে। এগুলো হচ্ছে উদ্দীপক পরিস্থিতি (Stimulus Situation), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (Organism), আচরণ (Behavior), কার্যসম্পাদন (Accomplishment)। ব্যক্তি যখন কোনো উত্তেজকের মুখোমুখি হয়, তখন তার স্নায়ুতন্ত্র বা দেহে এর অনুভূতি জাগে। উত্তেজনার প্রভাবটি বিদ্যুৎবেগে তার স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছায় এবং মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তেজকের সাথে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে এবং এর প্রভাবে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট আচরণ করে। এ আচরণের দ্বারা সে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রবৃত্ত হয়। যখন লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে তখন তার আচরণও শেষ হয়ে যায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আচরণের এ কারণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, অফিসের একজন কর্মচারী সময়মতো অফিসে না আসার কারণে তার বস তাকে তিরস্কার করলেন। কর্মচারীটি মর্মবেদনায় মুখ ভার করে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পর কেঁদে ফেললেন। সবশেষে সে অফিস থেকে সেদিনের জন্য বের হয়ে গেলেন। কর্মচারীর এ আচরণের মধ্যে কারণ তত্ত্বের প্রভাব ও অনুক্রমসমূহ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বস কর্তৃক কর্মচারীকে তিরস্কার করা হচ্ছে উদ্দীপক পরিস্থিতি (Stimulus Situation) কর্মচারীর মর্মবেদনায় মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকা হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (Organism), তার কেঁদে ফেলা হচ্ছে আচরণ (Behavior) এবং অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়া হলো কার্যসম্পাদন (Accomplishment)। ওপরের ঘটনাটির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে SOBA মডেল দেখা যায়। এ ঘটনাটি অন্যভাবেও ঘটতে পারত। বস কর্মচারীর ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করতে পারতেন। তখন ঐ কর্মচারী কিছুক্ষণ নীরবে আনন্দে দাঁড়িয়ে থেকে বসকে সালাম করতে

পারত। সবশেষে বসের কাছ থেকে সে একটি প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট পেতে পারত। এ ঘটনার মধ্যেও আচরণের সেই স্বীকৃত মডেল দেখা যায়। এখানে প্রশংসা হচ্ছে S, নীরব আনন্দ বা মনের আবেগ হচ্ছে O, বসকে সালাম করা হচ্ছে B এবং প্রশংসার সার্টিফিকেট হচ্ছে A।

আমরা যদি বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রতিটি আচরণের মধ্যেই কারণ সম্পর্কিত এ পর্যায়ক্রমটি লক্ষ্য করা যায়। এটি আচরণের কারণ তত্ত্ব বা মডেল নামে সুপরিচিত।

একই কারণে আচরণ ভিন্ন হতে পারে

The Same Cause May Result into Different Behavior

বিভিন্ন ধরনের মানুষের আচরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে-কোনো বিষয় নিয়ে মানুষের বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণ, গ্রহণ ক্ষমতা, শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, প্রেষণা ইত্যাদিও এক রকম নয়। সে কারণেই একই ঘটনা বা একই উদ্দীপক বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। কাজেই মানুষ একই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ভিন্ন ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে থাকে।

মানুষ একই কারণে যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে সে সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক, রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা দেখে একজন মানুষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। অপর একজন ব্যক্তি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়। আর একজন ব্যক্তি দুর্ঘটনা দেখেও না দেখার ভান করে নীরবে স্থান ত্যাগ করে।

এখানে দেখা গেল যে, উদ্দীপক বা কারণ হলো একটি 'দুর্ঘটনা'। যে তিন ব্যক্তি সেখানে ছিল তাদের তিন ধরনের আচরণ প্রকাশ করা হলো। যেমন: একজন বিচলিত হয়েছে, একজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছে এবং আর একজন নীরবে স্থান ত্যাগ করেছে। এরূপ পরিস্থিতিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। উদ্দীপককে S দ্বারা, বর্ণিত তিন ব্যক্তিকে যথাক্রমে, O_1, O_2 এবং O_3 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। তাদের তিন ধরনের আচরণকে B_1, B_2 এবং B_3 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো।

এমতাবস্থায় চিত্রটি দাঁড়ায়-

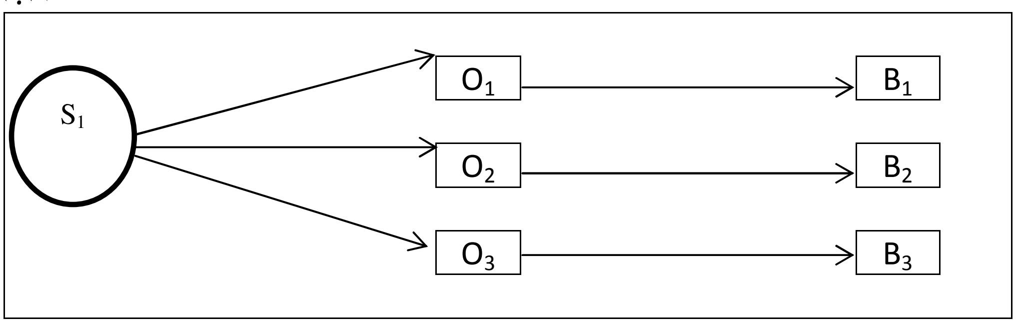

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, উদ্দীপক বা আচরণের কারণ এক। কিন্তু ব্যক্তি ও তাদের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং দেখা যায় যে, একই কারণে বা একই উদ্দীপকের ফলশ্রুতিতে মানুষের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এর কারণ হলো মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, প্রেষণা, মূল্যবোধ, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য। মনোবিজ্ঞানী Maire এজন্যই বলেছেন যে, "The same situation may cause a variety of behaviors." অর্থাৎ, একই উদ্দীপক বা অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন আচরণ সৃষ্টি করতে পারে।

একই আচরণের ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে

The Same Behavior May have Different Causes

একই কারণে মানুষ যেমন ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে তেমনি মানুষের একই আচরণের পেছনেও ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সমাজ-সংসারের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক মানুষ একই ধরনের আচরণ করে। তবে এর কারণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। এক্ষেত্রেও মানুষের প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা, মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি, শিক্ষা, প্রেষণা, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রভাবকে দায়ী করা যায়।

একই আচরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উদ্দীপক বা কারণ থাকে এবং তা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তিনজন শ্রমিক তিন ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিকসংঘে যোগদান করেছে। একজন ভবিষ্যতে নেতা হওয়ার জন্য, আর একজন পরিচিতি লাভের জন্য এবং আর একজন বেশি সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিক সংঘে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তিনজনের উদ্দেশ্য বা কারণ তিন রকমের। বিষয়টিকে একটি চিত্রের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়:

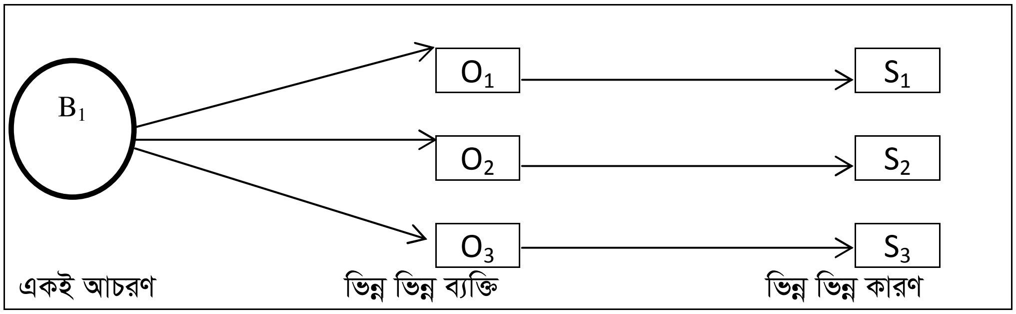

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, শ্রমিকসংঘে যোগ দেওয়ার ঘটনাকে বা একই ঘটনাকে বা একই আচরণকে চিত্রে B_1 দ্বারা এবং তিনজন শ্রমিককে O_1, O_2, O_3 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের তিন ধরনের কারণ হচ্ছে যথাক্রমে S_1, S_2 এবং S_3। উপর্যুক্ত ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের একই আচরণের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ বা উদ্দীপক জড়িত থাকতে পারে। মনোবিজ্ঞানী Maire তাই বলেন যে, "Any kind of given behavior may have many causes." অর্থাৎ একই ধরনের নির্দিষ্ট আচরণের অনেক কারণ থাকতে পারে।

আচরণ পরিবর্তনের উপায় বা পন্থা

Ways or Techniques to Change Behavior

ব্যক্তির আচরণ সাধারণভাবে স্থায়ী হলেও এটি একেবারে চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং, সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা সম্ভব। নীচে আচরণ পরিবর্তনের উপায়গুলো তুলে ধরা হলো:

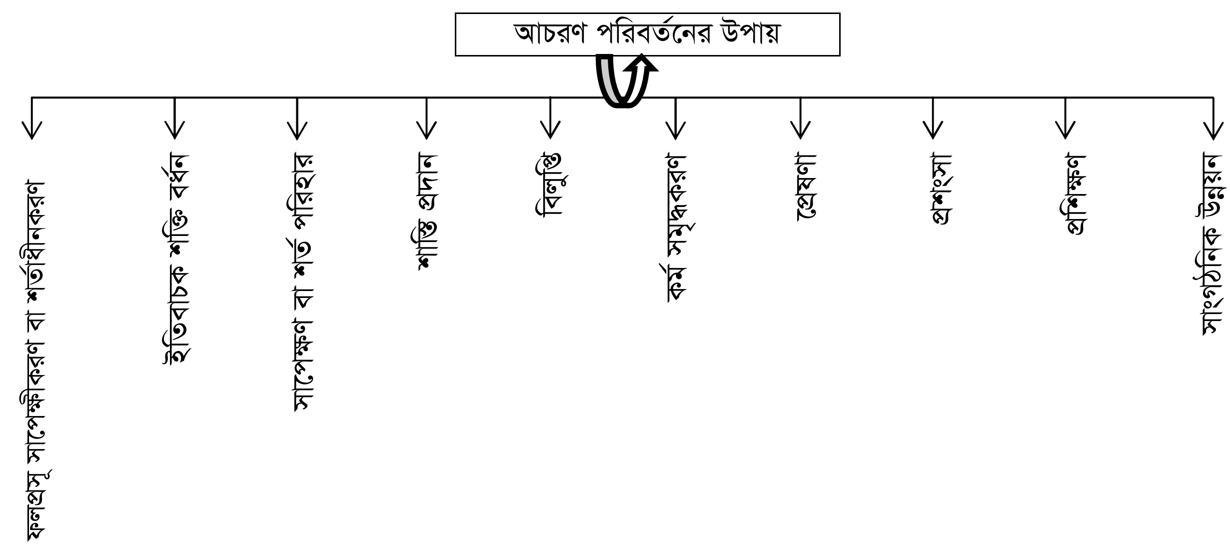

১. **ফলপ্রসূ সাপেক্ষীকরণ বা শর্তাধীনকরণ (Effective Conditioning):** পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ নতুন নতুন বহু কিছু আয়ত্ত করে। একই নিয়মে সে নতুন ধরনের আচরণও শেখে। পুরনো আচরণের পরিবর্তে নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকে ফলপ্রসূ সাপেক্ষীকরণ বা শর্তানধীনকরণ বলে।

২. **ইতিবাচক শক্তি বর্ধন (Positive Reinforcement):** ইতিবাচক শক্তিবর্ধন এর অর্থ হলো- মানুষকে প্রণোদিত করা। তা যে-কোনোভাবেই হতে পারে। পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। পুরস্কারের মাত্রা

যত ব্যাপক, স্থায়ী ও শক্তিশালী হয়, আচরণ পরিবর্তন করাও তত সহজ হয়। ইতিবাচক শক্তি বর্ধন এর মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় বেতন, পদোন্নতি, কাজের স্বীকৃতি, সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

৩. **সাপেক্ষণ বা শর্ত পরিহার (Escape Conditioning):** এটি আচরণ পরিবর্তনের একটি নেতিবাচক দিক। এতে পরিবেশ বা অবস্থার খারাপ দিকগুলো বাদ দেওয়ার জন্য ভিন্ন উপায়ে আচরণ সংশোধনের চেষ্টা চালানো হয়। যেমন: কোনো কর্মী কাজ না করলে তাকে তিরস্কার করা। এতে তিরস্কারের ভয়ে কর্মী কাজ করে।

৪. **শাস্তি প্রদান (Punishment):** শাস্তি প্রদান করা আচরণ পরিবর্তনের একটি সাধারণ উপায়। এর প্রকৃতি মূলত নেতিবাচক। বহু চেষ্টার পরেও কোনো ব্যক্তি যদি প্রত্যাশিত আচরণ না করে, তখন বাধ্য হয়ে তাকে শাস্তি দিতে হয়। শাস্তির ভয়ে মানুষ পুরনো আচরণ ত্যাগ করে।

৫. **বিলুপ্তি (Extinction):** আচরণ পরিবর্তনের এটিও একটি পন্থা। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক শক্তি বর্ধন ব্যবস্থাগুলো বন্ধ রাখা হয় এবং তার পরিবর্তে সুচতুর কৌশল গ্রহণ করা হয়। যেমন: ক্লাসের কোনো ছাত্র অত্যধিক দুষ্টুমি করলে তার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা। শিক্ষকের সার্বক্ষণিক নজরদারির ফলে ছাত্রের পুরনো আচরণ বিলুপ্ত হয়।

৬. **কর্ম সমৃদ্ধকরণ (Job Enrichment):** ব্যক্তি আচরণ পরিবর্তনের এটি ইতিবাচক ও উৎকৃষ্ট কৌশল। এক্ষেত্রে কর্মীর কাজ বা পদকে বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণীয় করা হয়। এতে ঐ ব্যক্তির একঘেয়েমি ও অসন্তুষ্টি দূর হয় এবং তার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

৭. **প্রেষণা (Motivation):** আচরণ পরিবর্তনের এটি একটি পন্থা। ব্যক্তি আচরণের সাথে মানবিক অভিপ্রায় ও অভাব পূরণের বিষয়টি জড়িত থাকে। সুতরাং ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের অভাব পূরণের মাধ্যমে তার মধ্যে সন্তুষ্টিবোধ আনা যায়। এতে তার আচরণে পরিবর্তন আসে।

৮. **প্রশংসা (Praises):** আচরণ পরিবর্তনের আর একটি ইতিবাচক পদ্ধতি হলো প্রশংসা। কোনো ব্যক্তিকে যখন তার গুণাবলি সম্পর্কে প্রশংসা করা হয় তখন তার আচরণে নমনীয়তা আসে। প্রশংসার ফলে ব্যক্তির আচরণে কিছুতা হলেও পরিবর্তন আসে।

৯. **প্রশিক্ষণ (Training):** মানুষের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণও একটি ফলপ্রসূ উপায়। এ প্রক্রিয়ায় মানুষ নতুন নতুন কর্মকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। প্রশিক্ষণ ব্যক্তির মনোভাব পরিবর্তনেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এতে ব্যক্তির আচরণেও আবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবর্তন সূচিত হয়।

১০. **সাংগঠনিক উন্নয়ন (Organizational Development):** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মীদের আচরণ পরিবর্তিত করা সম্ভব। যেমন: নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও কৌশলাদি চালু করা হলে কর্মীরা পুরনো ধ্যানধারণা ও মনোভাব পরিবর্তন করে। এতে কর্মীর আচরণও পরিবর্তিত হয়।

উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে ব্যবস্থাসমূহের ক্রমাগত ও পরিকল্পিত অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ আচরণের কারণ তত্ত্ব বর্ণনা করুন। বাস্তবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন এবং খাতায় লিখুন যে, মানুষেরা কেন ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে।

সারসংক্ষেপ

মানুষ যখন উত্তেজকের মুখোমুখি হয়, তখন স্নায়ুতন্ত্রে এর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং দেহগত অনুভূতিগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রতিক্রিয়ার পরিপূর্ণ রূপই হলো আচরণ। মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণের কারণ সম্পর্কে অনেক পর্যালোচনা করে একটি মডেল প্রদান করেছেন, যা 'SOBA'* নামে পরিচিত। অর্থাৎ S= Stimulus Situation, O= Organization, B= Behaviour এবং A= Accomplishment । বিভিন্ন ধরনের মানুষের আচরণ বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে-কোনো বিষয় নিয়ে মানুষের বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণ, গ্রহণ ক্ষমতা, শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, প্রেষণা ইত্যাদিও এক রকম নয়। সে কারণেই একই ঘটনা বা একই উদ্দীপক বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। কাজেই মানুষ একই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ভিন্ন ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। আবার বিপরীত ও ঘটে। অর্থাৎ আচরণের কারণ একই কিন্তু বিভিন্ন জনের আচরণ ভিন্ন। আচরণ পরিবর্তনের অনেকগুলো উপায় আছে, যেমন: ফলপ্রসূ শর্তাধীনকরণ, ইতিবাচক শক্তিবর্ধন, শাস্তি প্রদান, বিলুপ্তি, কর্মসমৃদ্ধকরণ, প্রেষণার প্রশংসা ও প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক উন্নয়ন প্রভৃতি।

পাঠ-৩.৪ কে, লিউইনের আচরণ মডেল; সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ
Behavioral Model of K. Lewin, Basic Approaches of Organizational Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কে, লিউইনের আচরণ মডেল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

কে, লিউইনের আচরণ মডেল
Behavioral Model of K. Lewin

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যায় এমন বিশ্লেষণযোগ্য কার্যকলাপই হচ্ছে মানুষের আচরণ। মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণকে দু দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেন- একটি হলো (Overt) এবং অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণ (Covert)। বাহ্যিক আচরণ বলতে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, এমন আচরণকে বুঝায়। অন্যদিকে, যেসব আচরণ বাইরে থেকে দেখা যায় না এবং ব্যক্তির ভেতরে ভেতরে যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হয়, তা হলো অভ্যন্তরীণ আচরণ। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে লুকানো অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো অনুমান করা যায় এবং প্রত্যেক বাহ্যিক আচরণের পিছনে এসব অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রভাবও কাজ করে। যেমন: ব্যক্তির চিন্তা, ব্যক্তিত্ব, প্রেষণা ইত্যাদি। ব্যক্তির আচরণ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। এটি বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারাও নির্ধারিত হয়ে থাকে। আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তির যে কর্মকান্ড প্রকাশিত হয়, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তি তার আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। তাই মনোবিজ্ঞানী ও আচরণ বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আচরণকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী K. Lewin এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে ব্যক্তি আচরণকে প্রকাশ করেছেন। সমীকরণটি হলো:

$$B = F (PxE)$$

এখানে, B = Behavior বা আচরণ
F = Function
P = Person বা ব্যক্তি
E = Environment বা পরিবেশ।

K. Lewin এর মডেলের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে বুঝতে হলে আরও কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এগুলো হলো-

ক. মানুষ কেন বিশেষ সময়ে বিশেষ আচরণ করে;
খ. কেন সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে;
গ. কোন্ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সে ধাবিত হয় এবং
ঘ. কোন্ তাড়না বা অভিপ্রায় মানুষকে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে।

ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এসব বিষয়ের উত্তর পাওয়া যায়। আচরণ বিশ্লেষণের উপাদান গুলো নিম্নরূপ:

ক. উদ্দীপক (Stimulus):পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের আচরণের পিছনে কোনো না কোনো কারণ জড়িত থাকে। বিনা কারণে মানুষ কোনো আচরণ করে না। কারণ যাই হোক না কেন, এগুলোই মানুষকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

খ. প্রতিক্রিয়া (Reaction): মানুষই উদ্দীপকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উদ্দীপক বা উত্তেজক ইতিবাচক বা নেতিবাচক হলে প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক বা নেতিবাচক হয়ে থাকে। কখনো কখনো অবশ্য ব্যতিক্রমও হতে

দেখা যায়- যেখানে ইতিবাচক উত্তেজকের কারণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কিংবা নেতিবাচক উদ্দীপকের প্রভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

গ. তাড়না (Drive): ব্যক্তির তাড়না বা অভিপ্রায় থেকেই মূলত তার আচরণের উদ্ভব হয়। তাড়না বলতে এমন একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বুঝায়- যা ব্যক্তিকে নিশ্চিত কার্যসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তির মধ্যে যদি তাড়না না থাকতো, তাহলে সে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতো না। তাড়না যখন তীব্র হয়, ব্যক্তিও তখন লক্ষ্য অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অর্থাৎ, তাড়নার তীব্রতার উপর আচরণের তীব্রতা নির্ভর করে।

ঘ. লক্ষ্য (Goal): সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যক্তি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয় এবং নির্দিষ্ট আচরণে লিপ্ত হয়। লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তির মধ্যে তাই কোনো প্রতিক্রিয়া ও তাড়না সৃষ্টি হতো না। তাই লক্ষ্য পূরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপরিল্লিখিত উপাদানসমূহ অনুধাবন করা যায়। আচরণের এসব উপাদান বা ঘটনা প্রবাহ নীচে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

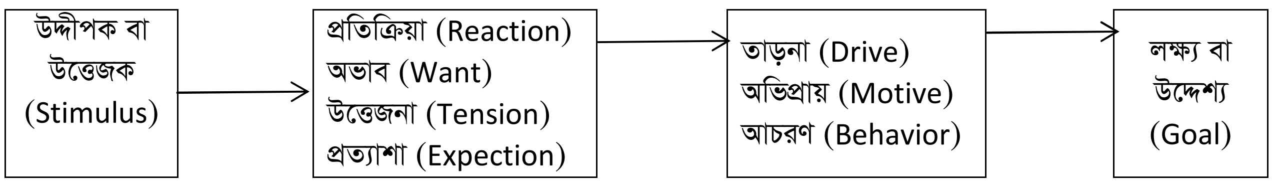

চিত্র: Lewin এর আচরণ মডেলের চারটি ধাপ।

সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ

Basic Approaches of Organizational Behavior

সাংগঠনিক আচরণের পাঁচটি মৌলিক মতবাদ রয়েছে। সাংগঠনিক আচরণ অধ্যয়নের মাধ্যমে এ সকল মতবাদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক মতবাদসমূহ হলো:

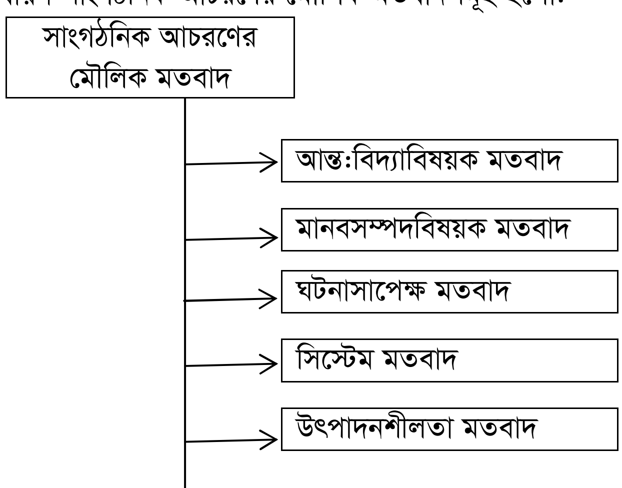

বর্তমান আলোচনায় এ মতবাদসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. আন্ত:বিদ্যাবিষয়ক মতবাদ (Inter-disciplinary Approch): যে মতবাদ সাংগঠনিক আচরণকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে, তা-ই আন্ত:বিদ্যা বিষয়ক মতবাদ। সাংগঠনিক আচরণ হলো একটি আন্ত:বিদ্যা বিষয়ক মতবাদ। এটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংহতি বিধান করে। সাংগঠনিক আচরণ এসব থেকে এমন সব ধারণা গ্রহণ করে যা সংগঠন এবং কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্ককে উন্নত করতে সহায়তা করে। এখানে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করা হয় এবং এইজন্যই মানুষের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার বিদ্যা এক্ষেত্রে একীভুত হয় এবং অধ্যয়ন করা হয়।

২. মানবসম্পদবিষয়ক মতবাদ (Human Resource Approach): মানবসম্পদ মূলত উন্নয়নমূলক। এটি কর্মীদের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ মতবাদ কর্মীদের যোগ্যতা, সৃজনশীলতা ও পরিপূর্ণতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। একে সমর্থনমূলক মতবাদও বলা হয়। কেননা, এতে ধ্রুপদী মতবাদের মত কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি থাকে না এবং নির্বাহীরা কর্মীদের দক্ষতা অর্জনে পূর্ণ সহযোগিতা দেন এবং তাদের পূর্ণ যোগ্যতার বিকাশলাভ করতে সমর্থন দিয়ে যাবেন।

৩. ঘটনাসাপেক্ষ মতবাদ (Contingnency Approach): গতানুগতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনার নীতিমালাকে সর্বজনীন বিষয় বলে মনে করা হতো এবং বিশ্বাস করা হতো যে, এগুলো যে-কোনো ধরনের সংগঠন বা যে-কোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভবপর। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এ ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটেছে ঘটনা সাপেক্ষ মতবাদের। এ মতবাদের মূল কথা হলো- দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার আচরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। সাংগঠনিক আচরণের এ মতবাদকে কখনও কখনও পরিস্থিতিভিত্তিক মতবাদও বলা হয়ে থাকে। কেননা এতে পরিস্থিতিগত চলকসমূহের উপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিস্থিতির কারণে যা করণীয় তা-ই এখানে গ্রহণ করা হয়। তাই এটিকে ঘটনাসাপেক্ষ মতবাদ বর্ণনা বলা হয়।

৪. সিস্টেম মতবাদ (System Approach): সংগঠন হলো একটি সামাজিক সিস্টেম। এ সিস্টেমের মধ্যে বহু চলক রয়েছে যেগুলো একে অন্যকে প্রভাবিত করে। যে-কোনো ব্যক্তির কার্যক্রমের দ্বারা পুরো সিস্টেম বা এর বৃহত্তর অংশ প্রভাবিত হতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক নির্বাহীকে কার্যক্রম গ্রহণের আগে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও বিবেচনা করতে হবে।

৫. উৎপাদনশীলতা মতবাদ (Productivity Approach): যে-কোনো সংগঠনে উৎপাদনশীলতার উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। উৎপাদনশীলতা হলো ইনপুট ও আউটপুটের অনুপাত। একই পরিমাণ ইনপুট থেকে যদি অধিক পরিমাণ আউটপুট বের করা যায় তাহলে উৎপাদনশীলতা ভালো প্রকাশ পায়। এটি সম্পদের ন্যুনতম অপচয় রোধ করে এবং সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে। উৎপাদনশীলতার ধারণাটি সামাজিক ও মানবীয় দিক থেকেও বিবেচনা করা হয়।

এসব মতবাদ অধ্যয়ন করলে সাংগঠনিক আচরণ সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপকদেরকে এ সকল মতবাদ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ কে, লিউইনের আচরণ মডেল বিশ্লেষণ করবেন এবং সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষের আচরণ দু'ধরনের- বাহ্যিক (Overt) আর অভ্যন্তরীণ (Lovert)। বাহ্যিক আচরণ দেখা যায় আর অভ্যন্তরীণ আচরণ দেখা যায় না। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী K. Lewin ব্যক্তি আচরণের একটি গাণিতিক মডেল প্রণয়ন করেছেন। এটি হলো- B= F (PXE)| অর্থাৎ B= আচরণ (Behavior); F= কার্যাবলি (Function) P= ব্যক্তি (Person) এবং E= পরিবেশ (Environment)। এ গাণিতিক মডেল বুঝতে হলে তার মডেলের চারটি পর্যায় বা ধাপ সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলো হলো- উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া, তাড়না এবং লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচ বা মতবাদ পাঁচটি, যেমন: আন্ত:বিদ্যাবিষয়ক মতবাদ, মানবসম্পদ মতবাদ, ঘটনাসাপেক্ষ মতবাদ, সিস্টেম মতবাদ এবং উৎপাদনশীলতা মতবাদ।

পাঠ-৩.৫ দলের সংজ্ঞা; দলের কাজ; দলের সুবিধা; দলের বৈশিষ্ট্য

Defination of Group, Functions of Group, Advantages of Group, Features of Group

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- দলের কাজ শিখতে পারবেন;
- দলের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- দলের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

দলের সংজ্ঞা

Defination of Group

সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে একইভাবে কার্যসম্পাদন করেন, তাকে দল বলে। কতিপয় লোক মিলে দল গঠন করা হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূণ্যতা, পরস্পরের কাছে আসা, নতুন শক্তি বৃদ্ধি পায়। দল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞা দেওয়া হলোঃ

S. P. Robbins এর মতে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন মিলিত হয়, পরস্পর নির্ভরশীল হয়, যারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এসেছে, তাদেরকে দল বলে। (A group is defined as two or more individuals, interacting and independent, who have come to achieve particular objective.)

R. Griffin বলেন, "দল হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যারা প্রতিনিয়ত মিলিত হয় একই সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য।" (Group is two or more person who interact regularly to accomplish a common purpose of goal.)

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দল এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ
(১) দল একাধিক ব্যক্তির সম্মিলন;
(২) দল এর সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে;
(৩) দল এর অন্তর্গত সদস্যদের লক্ষ্য একই হয়ে থাকে;
(৪) দল এর সদস্যদের ব্যক্তিক স্বার্থ ও দলগত স্বার্থ এক হয়ে যায়;
(৫) দলের সদস্যরা দলের নীতি, আচরণ, আদর্শ প্রভৃতি মেনে চলে।

সুতরাং বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক সচেতন, একই আদর্শ ও মূল্যধারা যেমনঃ ব্যক্তি যখন সেবাদান উদ্দেশ্যার্জনের জন্য একত্রিত হয়, তখন তাকে দল বলে। এটি একটি সামাজিক সংগঠন।

দলের কাজ

Functions of Group

দলের অনেক কাজ আছে। তারা সদস্যদের আচরণ, মনোভাব, মূল্যবোধ প্রভৃতি পরিবর্তন করতে পারে এবং সদস্যদের শৃংখলাবদ্ধ করতে পারে। যাহোক, নীচের দলের কার্যাবলি দেওয়া হলোঃ

১. দলীয় সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।
২. সদস্যরা যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।
৩. দলের সদস্যদের ব্যক্তিক লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। এতে প্রতিষ্ঠান ও দল উভয়ের স্বার্থই রক্ষিত হয়।
৪. সম্মিলিতভাবে কাজ করলে যে সদস্যদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

৫. কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা, যেমনঃ যে-কোনো পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো, সদস্যদের মতামতকে বিবেচনা করা, দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা প্রভৃতি।

দলের সুবিধা

Advantages of Group

দলগতভাবে কার্যসম্পাদনের নানাবিধ সুবিধা রয়েছে, যেমনঃ

১. কর্মীদের বিদ্যমান হতাশা দূর হয়। কারণ দলগতভাবে কাজ করলে নিরাপদ থাকা যায়।
২. কর্মীদের মনোবল বাড়ে। কারণ দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।
৩. দলীয়ভাবে কাজ করলে ভুলত্রুটি কম হয়। ফলে দলীয় কাজে সফলতা আসে।
৪. দলীয় কাজে সফলতা কিংবা ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই সকলে সমান ভাগীদার। ফলে ব্যর্থতার দায়ভার কারো জন্যই বোঝানো হয় না।
৫. দলীয়ভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অধিক ফলপ্রসূ হয়। কারণ এতে সকলের মতামত প্রতিফলিত হয়।
৬. দলীয়ভাবে কাজ করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে।
৭. দলভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে প্রতিষ্ঠানে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
৮. দলীয় সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

দলের বৈশিষ্ট্য

Features of Group

কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রতিটি দলই গড়ে ওঠে। দলগুলোতে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপঃ

১. **আন্তঃক্রিয়া (Interaction):** দলের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে মত বিনিময় করে থাকে। এটিকে বলা হয় আন্তঃক্রিয়া। মূলত অভ্যন্তরীণ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই প্রতিটি দল তাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড ঠিক ও পরিচালনা করে থাকে।

২. **আদর্শ ও নিয়মকানুন (Norms & Rules):** প্রতিটি দলের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন এবং আদর্শ থাকে। মূলত এই আদর্শের ভিত্তিতেই দল গড়ে ওঠে এবং নিয়মকানুনের ভিত্তিতে তা পরিচালিত হয়। দল ছোট বা বড় যাহোক না কেন আদর্শ ও নিয়মকানুন ব্যতীত চলতে পারে না।

৩. **আচরণ পদ্ধতি (Behavior System):** দলের সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের আচরণ পদ্ধতি ঠিক করে নেয়। সদস্যরা পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে এবং দলের নেতাকে তারা কীভাবে অনুসরণ করবে তা আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। এর ভিত্তিতেই সকল সদস্যরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকে।

৪. **বণ্টিত লক্ষ্য (Shared Goals):** দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে নেয়। এতে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবাই ভূমিকা রাখতে পারে। যে লক্ষ্যে দল গঠিত হয় সেই লক্ষ্য যেহেতু সব সদস্যের স্বার্থের পক্ষে থাকে, তাই সবাই এক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় ভূমিকা পালন করে।

৫. **সামঞ্জস্যতা (Conformity):** দলের সকল কার্যক্রম যেমনঃ সদস্যদের আচরণ, নিয়মকানুন, আদর্শ সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিরাজ করে। উদাহরণস্বরূপ- দলের আদর্শ যদি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে নেতা নির্বাচন, কার্যক্রম পরিচালনা, আচরণ সব কিছুই গণতান্ত্রিক হতে হবে।

৬. **আকর্ষণের নেটওয়ার্ক (Network of Attraction):** সদস্যদের কাছে দল একটি আকর্ষণীয় বিষয়। এ জন্য দলকেই সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হতে হয়। সদস্যরা আকষর্ণ অনুভব না করলে দল থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এতে দল আর আগের অবস্থায় থাকে না। সুতরাং আকর্ষণের নেটওয়ার্ক সৃষ্টির জন্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. **আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব (Formal Leadership):** দলের অবশ্যই একটি আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের ধারা থাকতে হবে। দলের একটি কমিটি থাকবে যারা দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেবেন। অন্যথায়- দল সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না।

দলের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো পর্যায়ে কোনো দল গঠনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবশ্যই থাকা দরকার।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ দল এর বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাসাইমেন্ট প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখান।

সারসংক্ষেপ

সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে একইভাবে কার্যসম্পাদন করেন, তাকে দল বলে। কতিপয় লোক মিলে দল গঠন করা হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূণ্যতা, পরস্পরের কাছে আসা, নতুন শক্তি বৃদ্ধি পায়। দল সম্পর্কে S. P. Robbins এর মতে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন মিলিত হয়, পরস্পর নির্ভরশীল হয়, যারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এসেছে, তাদেরকে দল বলে। দলগতভাবে কার্যসম্পাদনের নানাবিধ সুবিধা রয়েছে, যেমনঃ ১. কর্মীদের বিদ্যমান হতাশা দূর হয়। কারণ, দলগত ভাবে কাজ করলে নিরাপদ থাকা যায়। ২. কর্মীদের মনোবল বাড়ে। কারণ, দলগত ভাবে কাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। ৩. দলীয়ভাবে কাজ করলে ভুলত্রুটি কম হয়। ফলে দলীয় কাজে সফলতা আসে। ৪. দলীয় কাজে সফলতা কিংবা ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই সকলে সমান ভাগীদার। ফলে ব্যর্থতার দায়ভার কারো জন্যই বোঝা হয় না। ৫. দলীয়ভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অধিক ফলপ্রসূ হয়। কারণ, এতে সকলের মতামত প্রতিফলিত হয়। ৬. দলীয়ভাবে কাজ করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ৭. দলভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে প্রতিষ্ঠানে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ৮. দলীয় সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

পাঠ-৩.৬ দলের জীবনচক্র বা দল গঠনের স্তরসমূহ; একজন সদস্য দলে কেন যোগ দেয়; দলের দুর্বলতা, দলকে কীভাবে কার্যকর করা যায়

Group Life Cycle or Stages of Group Formation; Why an individual join in a Group? Weakness of Group, How a Group Become More Effecive?

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দলের জীবনচক্র সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- একজন সদস্য দলে কেন যোগ দেয়, তার একটি কারণ জানতে পারবেন;
- দলের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- দলকে কার্যকর করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

দলের জীবনচক্র বা দল গঠনের স্তর সমূহ

Group Life Cycle or Stages of Group Formation

যেকোনো দল গড়ে ওঠার জন্য কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। হঠাৎ করে কোনো দল গড়ে ওঠে না। দল গড়ে ওঠার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। মানুষ একত্র হয় এবং তাউপর তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয়। তাউপর তারা নিজেরা বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি করে । নিয়মকানুন তৈরির পরই একটি দল স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারে। দল গঠনের এই পর্যায়গুলোকে দলের জীবনচক্র বা দল গঠনের স্তর বলে অভিহিত করা হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **গঠন (Formation):** এটি দল গঠনের প্রাথমিক স্তর। এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তি একত্র থাকে এবং তাদের মধ্যে দল গঠনের বোধ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে তারা প্রাথমিকভাবে দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক থাকে অনেকটা যান্ত্রিক এবং তারা একে অপরকে বোঝতে চেষ্টা করে। এ সময়ে সদস্যরা একে অপরের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলারও চেষ্টা করে। দল গঠনের এই পর্যায়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছতা সংশয়ও কাজ করে।

২. **ঝড় বা আন্দোলন (Storming):** দল গঠিত হয়ে গেলে সদস্যরা ক্রমেই একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং খোলাখুলি মত প্রকাশ করে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। এমন কি মতের পার্থক্যের কারণে দলের মধ্যে উপদলও সৃষ্টি হতে পারে। এ পর্যায়ে দলের মধ্যে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করে এবং বৃহত্তর দলের মধ্যে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায়। এ স্তরকে অনেকেই বিরোধিতার স্তর হিসাবেও অভিহিত করেন।

৩. **নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা (Norming):** এ পর্যায়ে দলের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দল পরিচালনার নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয়। নিয়মকানুন তৈরি করার মাধ্যমে দল প্রকৃতপক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এতে কোন্দল বা ভুল বুঝাবুঝি সীমিত হয়ে পড়ে এবং কাঠামোর আওতায় সকলে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে। এ স্তরকে সমঝোতা সৃষ্টির স্তর বলেও অনেকে অভিহিত করেন।

৪. **সম্পাদন (Performing):** দলের কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার পর এ পর্যায়ে দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে সকলেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। এই স্তরকে বলা হয় দলের ইতিবাচক উন্নয়নের সর্বশেষ ধাপ। কারণ, ব্যক্তির অঙ্গীকার, দক্ষতা, আন্তরিকতা সবই এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। কোনো দল কার্যসম্পাদন স্তরে প্রবেশ করলে দল গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে ধরা হয়।

৫. **স্থগিতকরণ (Adjourning):** দল গঠনের বা দলের জীবনচক্রের সর্বশেষ ধাপ হলো স্থগিতকরণ (Adjourning)। দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হলে অনেক সদস্যই আর দলে থাকতে চায় না। এ পর্যায়ে অনেকেই দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে

পড়েন বা দল থেকে চলে যান। ফলে দলটি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতবস্থায়, দলের সদস্যরা নতুন করে দল গড়ে তোলেন। তবে সংগঠন তার সৃজনশীলতা দিয়ে এই পর্যায়টি রোধ করতে পারেন। পরিবর্তনশীলতার সাথে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হলো সদস্যরা দলে থাকার আকর্ষণ হারায় না। ফলে দলটি দীর্ঘদিন টিকে থাকে। তবে যে দলগুলো সাময়িক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়, সেগুলো এ পর্যায়ে এসে নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

নীচে চিত্রের মাধ্যমে দল গঠনের স্তরসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

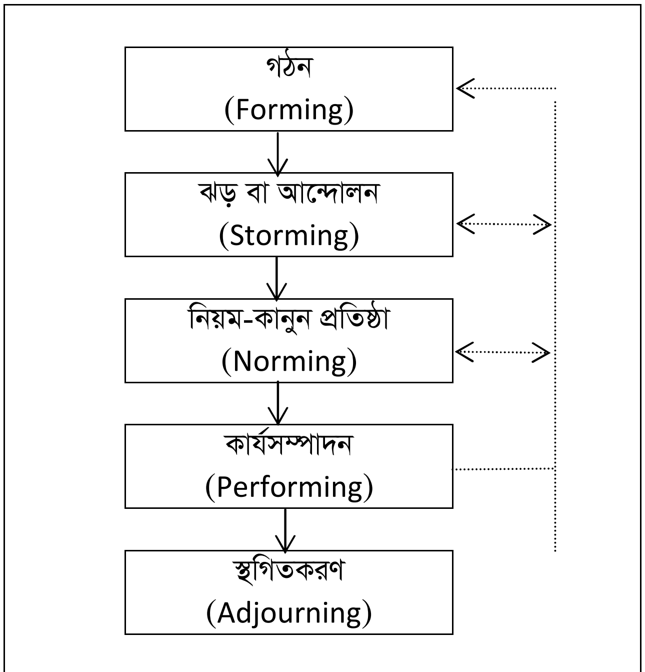

চিত্র: দল গঠনের স্তর বা পদক্ষেপ

একজন সদস্য কেন দলে যোগ দেয়?

Why an individual join in a Group

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তারা সংঘবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে। মানুষ কখনোই একা থাকতে পারে না। মানুষের এ সামাজিক চাহিদা থেকেই দলের সৃষ্টি। বিভিন্ন কারণে একজন ব্যক্তি দলের আওতায় আসে। সাধারণত: যেসব কারণে মানুষ দলে যোগ দিতে আগ্রহী হয়, তা নীচে আলোকপাত করা হলো:

১. **অন্তর্ভুক্তি (Affiliation):** আগেই বলা হয়েছে মানুষ একা থাকতে পারে না। তাই সে যে-কোনো একটি স্থানে সমমনা ব্যক্তিদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে পছন্দ করে। তার নিজের সময় কাটানোর জন্য বা ব্যক্তিগত অপর কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সে দলে যোগ দেয়।

২. **নিরাপত্তা (Security):** একক মানুষের চেয়ে দলবদ্ধ মানুষ অনেক বেশি নিরাপত্তা অর্জন করে। কারণ তার বিপদে অন্য সদস্যরা তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। এমনকি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকলেও মানুষ তার সঙ্গীর সমস্যায় মতভেদ ভুলে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এটি মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। অথচ দলহীন ব্যক্তি এই সহায়তা পায় না। তাই নিরাপত্তার স্বার্থেও মানুষ দলে যোগ দেয়।

৩. **অহংবোধ (Esteem):** একজন ব্যক্তি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্য হয়ে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। আবার কোনো সফল দলের সদস্য হয়ে অন্যের প্রশংসা অর্জন করতে পারে। যেমন অনেকেই লায়ন্স ক্লাবের বা রোটারি ক্লাবের সদস্য হয়ে গর্ববোধ করে। আবার অনেকে রোভার স্কাউটের সদস্য হয়ে নিজের সম্পাদিত কাজের জন্য প্রশংসা অর্জন করতে পারে যা দলের বাইরে থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

৪. **ক্ষমতা (Power):** দলবদ্ধ মানুষ অনেক বেশি শক্তিশালী। দলের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেও শক্তিশালী বা ক্ষমতাধরও হয়ে ওঠে। তাছাড়া দলের নেতা হিসাবে অন্যের সুবিধার বিষয়ে ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে তার ক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়।

৫. **পরিচিতি (Identity):** দল ব্যক্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। একজন ব্যক্তি কোনো দলের সদস্য হলে তার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষ একটি পূর্ব ধারণা অর্জন করে। তাছাড়া দলের সদস্য হিসাবে তার নিজের ব্যক্তিক আচরণ ও বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।

৬. **কার্যসম্পাদন (Performance):** মানুষ একা কাজ করে যে ফলাফল লাভ করে, সম্মিলিতভাবে সেই কাজে অধিক ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে যে সব কাজে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন, সেখানে সমমনা ব্যক্তিরা একত্রিত হলে সবার মেধা, দক্ষতা একত্র হয় এবং সফলতার সাথে কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৭. **কার্য পরিবেশের উন্নয়ন (Improved Working Condition):** কার্যক্ষেত্রে দল গঠনের উদ্দেশ্য হলো উন্নত কার্যপরিবেশ নিশ্চিত করা। এর সাথে যুক্ত থাকে কর্মীর অধিকার, কাজের নিরাপত্তা, মজুরি ইত্যাদি। সবাই একত্র হয়ে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবস্থাপনার নিকট থেকে উপযুক্ত পরিবেশ আদায় করে নেওয়া যায়। এজন্য মানুষ দলে যোগ দেয়।

উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও যে-কোনো কারণেই একজন ব্যক্তি দলে যোগ দিতে পারে। মানুষ দলে যোগ দেওয়ার জন্য তার পছন্দমতো যে কোনো কারণকে বেছে নিতে পারে। এটি নির্ভর করে ব্যক্তির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও মানসিক অবস্থার ওপর।

দলের দুর্বলতা

Weakness of Group

দলের যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি এর কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা আছে। নীচে এর দুর্বলতাসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. **হতাশা (Frustration):** দলের মধ্যে অধিকাংশের সিদ্ধান্তকে দলের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা হয় বলে কোনো বিষয়ে ব্যক্তির পৃথক কোনো মত থাকলেও তার প্রতি সম্মান দেওয়া হয় না। ফলে সে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়।

২. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব (Delay to Decission Making):** দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি প্রক্রিয়ার বিষয়। হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এমতাবস্থায় জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও কোনো বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

৩. **দায়িত্ব বিভাজনজনিত সমস্যা (Problem of Division of Responsibility):** ইংরেজিতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, Everyone responsibility means no one's responsibility। এর অর্থ হলো দায়িত্ব যখন সবার উপর অর্পিত হয় তখন সে দায়িত্ব আর কারো একার থাকে না। এই সুযোগে সবাই দায়িত্বে অবহেলা করতে পারে।

৪. **সৃজনশীলতার অভাব (Lack of Creativity):** দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য পায়। যে কারণে সৃজনশীল বিষয়সমূহ বিশেষ গুরুত্ব পায় না। কারণ, অধিকাংশ ব্যক্তিই সৃজনশীল বিষয়ের পরিবর্তে সাধারণ ধারার বিষয়গুলোই বেশি পছন্দ করে। এ কারণে দলে সৃজনশীলতার অভাব দেখা দিতে পারে।

৫. **নেতৃত্বের প্রতি অতি নির্ভরতা (Over Dependency on Leadership):** দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতার মনোভাবকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে এক পর্যায়ে নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠতে পারে। এতে নেতার ব্যর্থতায় সকলেরই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, এগুলো দলের দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত। তবে সৃজনশীল নেতৃত্ব এই সব দুর্বলতা কাটিয়ে দলকে গঠনমূলক ধারায় অগ্রসর করতে পারে।

দলকে কীভাবে অধিক কার্যকর করা যায়?

How a Group Become More Effecive?

একটি দল গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। যদি দলের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তাহলে দলকে কার্যকর বলা যাবে না। এজন্য দলকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করতে হলে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নীচে এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো:

১. দলের গঠনপ্রণালি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সকলকে সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

২. দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদস্যদেরকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে।

৩. যথাযথভাবে দলের বিন্যাস সাধন করতে হবে। অর্থাৎ দলের কাঠামো, নেতৃত্ব, পরিচালনা বিষয়ে নির্দিষ্ট রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে।

৪. সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে মূল্য দিতে হবে এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে।

৫. ধারণা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কাজকে আলাদা করতে হবে। কারণ যারা ধারণা উন্নয়ন করবেন তারা নিজেদের জাহির করার জন্য মূল্যায়ন সঠিকভাবে নাও করতে পারেন। এ কারণে উন্নয়ন ও মূল্যায়ন পৃথকভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন।

৬. কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো অনুমান থাকলে তা পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে।

৭. জিজ্ঞাসু মনোভাবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। অপরের প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে তাকে সদুত্তর প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ দলের জীবনচক্র আঁকুন ও বর্ণনা করুন এবং সদস্যদের দলে যোগ দেওয়ার কারণ ও দলের দুর্বলতা সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

দলের একটি জীবনচক্র আছে যেখানে পাঁচটি স্তর বিদ্যমান, যেমন: গঠন, আন্দোলন, নিয়মকানুন, কার্যসম্পাদন ও স্থগিতকরণ। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সামাজিক চাহিদা থেকেই মানুষ দলে যোগদান করে। তবে এর কতিপয় কারণ রয়েছে। যেমন: অন্তর্ভুক্তি, নিরাপত্তা, অহংবোধ, ক্ষমতা, পরিচিতি, কার্যসম্পাদন ও কার্যপরিবেশের উন্নয়ন। দলের বেশ কিছু দূর্বলতা আছে, যেমন: ব্যক্তি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়, দায়িত্বের ভাগাভাগিতে কার্যসম্পাদনে সমস্যা হয়। কর্মীদের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাব দেখা দেয়, এতে কর্মীগণ নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হতে পারে যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দলকে কার্যকর করা যায় এবং ভালো ফল পাওয়া যায়।

পাঠ-৩.৭ দলের প্রকারভেদ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের পার্থক্য
Types of Group, Difference between Formal Group & Informal Group

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দলের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

দলের প্রকারভেদ
Types of Group

দলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়, আনুষ্ঠানিক দল ও অনানুষ্ঠানিক দল। এ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের আওতায় আরও অনেক ধরনের দল গড়ে উঠতে পারে। নিচের তালিকার মাধ্যমে দলের শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করা হলো:

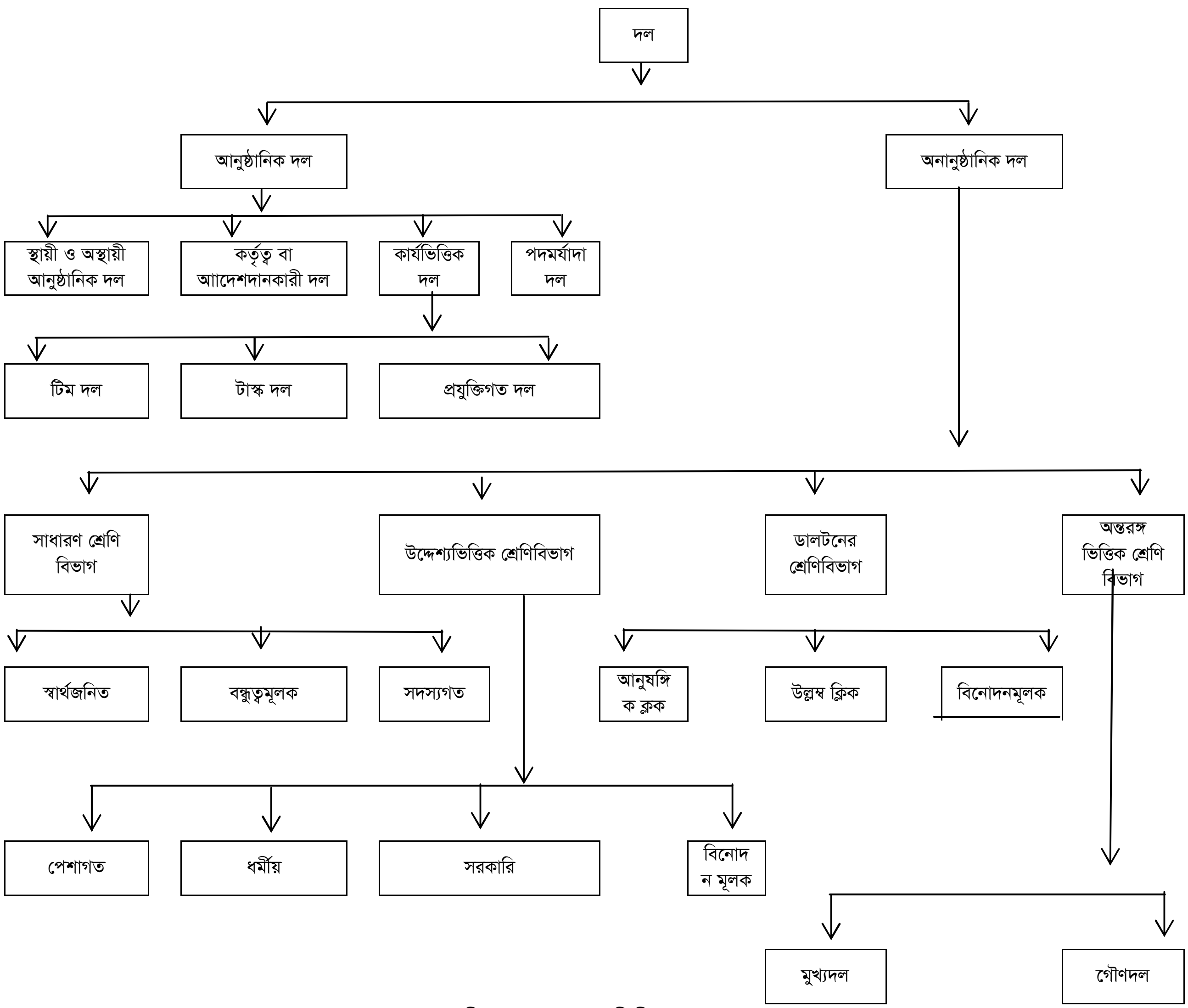

চিত্র : দলের শ্রেণিবিভাগ

আনুষ্ঠানিক দল

Formal Group

সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় যে দল গড়ে ওঠে তাকে আনুষ্ঠানিক দল বলে। নির্দিষ্ট কাজের জন্য সংগঠনে এ দল সৃষ্টি করা হয় এবং কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এ দলের সদস্য হিসাবে যুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে দলের সদস্য হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিগত মতামত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যে থাকবে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ দলে কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতা না দিয়ে তার তার পদমর্যাদাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক দলের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সংগঠন কাঠামোতে প্রদর্শন করা হয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা নিম্নমুখী। আনুষ্ঠানিক দল আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। যেমন:

- **স্থায়ী ও অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল (Permanent & Temporary Formal Group):** সংগঠনের মধ্যে স্থায়ীভাবে গঠিত দলকে স্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ, বিভাগীয় ইউনিট, যেমন: বিক্রয় দল, উৎপাদন দল ইত্যাদিকে স্থায়ী দল হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ, প্রতিষ্ঠান যতদিন টিকে থাকে, এই দলগুলোও ততদিন টিকে থাকে। আবার একটি বিশেষ কাজের ভিত্তিতে যখন কোনো দল গঠন করা হয় এবং কাজ শেষ হওয়ার পর সেই দলের আর অস্তিত্ব থাকে না তাকে অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল বলে। যেমন: নিয়োগ কমিটি, বেতন নির্ধারণ কমিটি ও টেন্ডার কমিটি ইত্যাদি।

- **কর্তৃত্ব বা আদেশদানকারী দল (Command Group):** সংগঠন কাঠামো আওতায় একাধিক বিভাগ ও উপবিভাগ থাকে। এই বিভাগ ও উপবিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় বিভাগীয় প্রধান বা সুপারভাইজারের ওপর। সংগঠন এই বিভাগীয় প্রধান ও সুপারভাইজারের কিছু ক্ষমতাও প্রদান করে থাকেন। এই ক্ষমতাবলে বিভাগীয় প্রধান বা সুপারভাইজররা তাদের অধীনস্থ কর্মীদের পরিচালনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তারা যে নির্দেশনার মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব দেন, তাকে আদেশ দল বলা হয়। এই দলের কর্মী বা সদস্যরা তাদের কাজের জন্য বিভাগীয় প্রধানের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন।

- **কার্যভিত্তিক দল (Functional Group):** কার্যসম্পাদনের জন্য যে দল গঠন করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক দল বলে। আদেশ দলের সাথে এ দলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সংগঠনের একটি বিভাগীয় দলকে একদিকে আদেশ দল এবং অপরদিকে কার্যভিত্তিক দলও বলা যেতে পারে। তবে একটি আদেশ দলের মধ্যে একাধিক কার্যভিত্তিক দল থাকতে পারে। সাধারণত কার্যভিত্তিক দল তিন ধরনের হতে পারে। এগুলো হলো টিম দল, টাস্ক দল ও প্রযুক্তিগত দল। যে দল স্থায়ীভাবে নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করে, তাকে টিম দল বলে। আর প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কার্যসম্পাদনের জন্য যে দল গঠিত হয়, তা-ই টাস্ক দল। প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক কার্যসম্পাদনের জন্য যে দল থাকে, তাকে প্রযুক্তিগত দল বলে।

অনানুষ্ঠানিক দল

Informal Group

সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে সাধারণ স্বার্থ, বন্ধুত্ব, নৈকট্য ইত্যাদির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক দল বলে। সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে এ দল গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেরই এ দলে যোগ দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই দল গড়ে ওঠে বিশেষ অবস্থায় এবং সদস্যদের নিজস্ব প্রয়োজনে। অনানুষ্ঠানিক দলকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। নীচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সাধারণ শ্রেণিবিভাগ: অনানুষ্ঠানিক দল সাধারণত তিন প্রকার। এগুলো হলো স্বার্থজনিত দল, বন্ধুত্বমূলক দল এবং সদস্যগত দল।

ক. স্বার্থজনিত দল (Interest Group): কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো দল গড়ে উঠলে তাকে স্বার্থজনিত দল বলে। সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ অর্জিত হলেই এই দলের অস্তিত্ব থাকে না। কর্মীরা বেতন বাড়ানোর জন্য কোনো দল গড়ে তুললে তাকে স্বার্থজনিত দল হিসাবে অভিহিত করা যায়।

খ. বন্ধুত্বমূলক দল (Friendship Group):সামাজিক পরিবেশের কারণে মানুষ মানুষকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। বয়স, সাধারণ মনোভাব, মর্যাদাগত অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষ দল গড়ে তোলে। এগুলোকে বন্ধুত্বমূলক দল বলে। যেমন: শিশু কিশোর সংঘ, তরুন সংঘ ইত্যাদি।

গ. সদস্যগত দল (Membership Group): যে দলে ব্যক্তি নিজে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে সদস্য হয়ে থাকে তাকে সদস্যগত দল বলে। যেমন: একটি প্রতিষ্ঠানে অফিসারদের ক্লাব থাকে। সকল অফিসার সেই ক্লাবকে তার নিজের মনে করে। যদিও সদস্য হিসাবে সে খুব একটা সক্রিয় থাকে না।

২. উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ: উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দলকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

ক. পেশাগত দল (Propessional Group): পেশার ভিত্তিতে কোনো দল গড়ে উঠলে তাকে পেশাগত দল বলে। যেমন: শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি, প্রকৌশলী সমিতি ইত্যাদি।

খ. ধর্মীয় দল (Religious Group): ধর্মীয়ভিত্তিতে কোনো দল গড়ে উঠলে তাকে ধর্মীয় দল বলে। যেমন: ইয়ং মেন ক্রিশ্চিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (YMCA)।

গ. সরকারি দল (Governmental Group): সরকার তার কাজের সুবিধার্থে যে দল গঠন করে তাকে সরকারি দল বলে। যেমন: মিউনিসিপ্যালিটি, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি।

ঘ. বিনোদনমূলক দল (Recreation Group): বিনোদনের উদ্দেশ্যে কোনো দল গড়ে উঠলে তাকে বিনোদনমূলক দল বলে। যেমন: ফুটবল ক্লাব, নাট্য দল ইত্যাদি।

৩. ডালটনের শ্রেণিবিভাগ: এম ডালটন তিন ধরনের অনানুষ্ঠানিক দলের কথা উল্লেখ করেছেন। নীচে এগুলো উপস্থাপন করা হলো:

ক. সমান্তরাল ক্লিক (Horizontal Cliques): সমমর্যাদা সম্পন্ন বা একই স্তরে কর্মরত ব্যক্তিরা কোনো দল গঠন করলে, তাকে সমান্তরাল ক্লিক বলা হয়। যেমন: অফিসারদের ক্লাব, শ্রমিকদের সংগঠন ইত্যাদি।

খ. উল্লম্ব ক্লিক (Vertical Cliques): একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা একত্রিত হয়ে কোনো দল গঠন করলে তাকে উলম্ব ক্লিক বলে। যেমন: বিক্রয় দলের ব্যবস্থাপক যদি কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়ে একটি দল গঠন করে তাকে উলম্ব ক্লিক বলা যাবে।

গ. মিশ্র ক্লিক (Mixed Cliques): সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শাখার কর্মীরা অনানুষ্ঠানিকভাবে কোনো দল গঠন করলে তাকে মিশ্র ক্লিক বলে।

৪. অন্তরঙ্গতাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ: অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতেও দল গড়ে উঠতে পারে। নীচে এগুলো উপস্থাপন করা হলো:

ক. মুখ্য দল (Primary Group): অন্তরঙ্গতা, নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে যে দল গঠিত হয়, তাকে প্রাথমিক দল বলে। এই দলে সদস্যরা একটি মধুর পরিবেশে অবস্থান করে। এই দলের আয়তন হয় ক্ষুদ্রাকৃতির। এরা একে অপরের সমস্যা বুঝতে পারে এবং তা সমাধানে সহায়তা প্রদান করে। পরিবার, সহকর্মী ও সঙ্গীদের নিয়ে এই দল গড়ে ওঠে।

খ. গৌণ দল (Secondarry Group): এই দলও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তবে এ ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গতার মাত্রা খুবই কম। এই দলে থাকা বা না থাকা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন জেলা সমিতি, পাস করা ছাত্রদের সমিতি এই দলের উদাহরণ।

আনুষ্ঠানিক দল ও অনানুষ্ঠানিক দলের মধ্যে পার্থক্য

Differences between Formal Group& Informal Group

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল ভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠে। এই দুই প্রকৃতির দলের মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যসমূহ এখানে আলোচনা করা হলো:

আনুষ্ঠানিক দল	অনানুষ্ঠানিক দল
১. সংগঠন কাঠামোর আওতায় এ দল গড়ে ওঠে।	১. সংগঠন কাঠামোর বাইরে এই দল গড়ে ওঠে।
২. এ দলের সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক।	২. এই দলে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।
৩. এ দলের উদ্দেশ্য এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য একই থাকে।	৩. এই দল ব্যক্তির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গড়ে ওঠে।
৪. সংগঠনের আওতায় এ দল গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সংগঠনই প্রধান।	৪. দলকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে উঠতে পারে।
৫. কাজের সুবিধার জন্য এ দল গড়ে তোলা হয়।	৫. সদস্যদের বিশেষ প্রয়োজনে এ দল গড়ে ওঠে।
৬. আনুষ্ঠানিক দল পরিচালিত হয় সংগঠনের নিয়মকানুন দ্বারা। সদস্যদের সৃষ্ট নিয়মকানুন দিয়ে নয়।	৬. অনানুষ্ঠানিক দল পরিচালনার নিয়মকানুন সদস্যরাই নির্ধারণ করেন।
৭. এ দলের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিম্নমুখী।	৭. এক্ষেত্রে দলের ক্ষমতা ঊর্ধ্বমুখী। সদস্যদের প্রদত্ত ক্ষমতাতেই দল শক্তি অর্জন করে।
৮. এ দল গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হয় না।	৮. এ দল গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ দলের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে খাতায় লিখুন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

সার সংক্ষেপ: দলকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় যে দল গড়ে ওঠে তা-ই আনুষ্ঠানিক দল। আর সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে সাধারণ স্বার্থ, বন্ধুত্ব নৈকট্য ইত্যাদির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে, তা-ই অনানুষ্ঠানিক দল। আনুষ্ঠানিক দল আবার কয়েক ধরনের; যেমনঃ স্থায়ী ও অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল, কর্তৃত্ব বা আদেশ দল, কার্যভিত্তিক দল, পদমর্যাদাগত দল। আবার অনানুষ্ঠানিক দলও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যেমনঃ স্বার্থজনিত দল, বন্ধুত্বমূলক দল, সদস্যগত দল। পেশাগত দল, ধর্মীয় দল, সরকারি দল, বিনোদনমূলক দল। মুখ্য দল, গৌণদল প্রভৃতি।

পাঠ-৩.৮ দলীয় কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ; হর্থন গবেষণা
Influencing Factors of Group Performance, Human Relation School, Hawthorne Study

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দলীয় কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হথর্ন গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।

দলীয় কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Influencing Factors of Group Performance

সংগঠনে দলের কার্যক্রম কয়েকটি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে কাজগুলো দলগতভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন, সে কাজে এই উপাদানগুলো বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। চিত্রে এ উপাদানগুলো উপস্থাপন করা হলো:

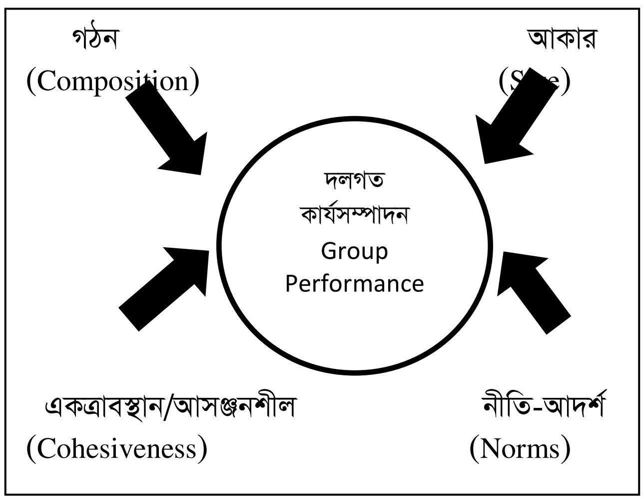

১. **গঠন (Composition):** দলের গঠনের উপর কার্যসম্পাদন এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। কারণ, একটি দল বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে। সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে আবার নানা ধরনের ব্যক্তি দলে থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সব দলে সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবস্থান করেন, সেখানে কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তোলা সহজ হয় এবং কার্যসম্পাদনে সুবিধা হয়। এর বিপরীতে দলের মধ্যে শিক্ষা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাভেদে অসমজাতীয় ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, দলের গঠনের উপর এর সফলতা এবং কাজের মান নির্ভর করে।

২. **আকার (Size):** কার্যসম্পাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনশীলতা দলের আকারের ওপরও নির্ভর করে। দলের আকার যদি বড় হয় তাহলে সেখানে দক্ষতা, যোগ্যতা, শিক্ষা ইত্যাদির একটি চমৎকার সমাবেশ থাকে। দলের মধ্যেই কার্যসম্পাদনের সকল শক্তি অবস্থান করায় দক্ষতার সাথে কার্যসম্পাদন করা সহজ হয়। দলের আকার ছোটো হলে সেখানে সব ধরনের দক্ষতার সমাবেশ থাকে না। ফলে অনেক উদ্দেশ্যই অর্জন করা সম্ভব হয় না।

৩. **আদর্শ ও নীতি (Norms):** দলের আদর্শ ও নীতিমালা কার্যসম্পাদনের উপর প্রভাব ফেলে। দল যদি নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসারী হয় এবং সেই আদর্শের সাথে যদি সদস্যরা সংহতি প্রকাশ করে তাহলে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তারা

সচেষ্ট হয়। আর যদি ব্যক্তিক আদর্শ এবং দলীয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহলে তারা সেই কাজ করতে খুব একটা আগ্রহী হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আদর্শবাদী ব্যক্তি ও দলের মধ্যে অঙ্গীকারের মাত্রা বেশি থাকে এবং কর্মসম্পাদনে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. **আসঞ্জনশীল বা সংবদ্ধতা বা একত্রাবস্থান (Cohesiveness):** এ ক্ষেত্রে নিবিড়তা বলতে দলের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকা বা না থাকার প্রবণতাকে নির্দেশ করে। দলের প্রতি আনুগত্য, দলের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা, দলের সদস্যদের প্রতি মমত্ববোধ ও সহযোগিতার নীতির ওপরই দলের নিবিড়তা বা একত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে নিবিড়তা ইতিবাচক পর্যায়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে দলীয় কার্যসম্পাদন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। আর দলের মধ্যে মতভেদ থাকলে বা দলীয় সংবদ্ধতা কম থাকলে সফলতা অর্জনের হার কম থাকে।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ কর্মসম্পাদনের উপর পৃথকভাবে প্রভাব ফেলে। এমতাবস্থায়, একজন ব্যবস্থাপক দলের আকৃতি, গঠন, তার নিবিড়তা ও আদর্শ বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যেন মূল লক্ষ্য অর্জনে দলকে কাজে লাগানো যায়।

মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ

Human Relation School

এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্যসম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোর দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়ম-কানুন বা মান ভালো কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। অনেক পণ্ডিতবর্গ এ মতবাদের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন, তবে Elton Mayo এবং Hugo Munsterberg এর অবদান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে Hugo Munsterberg "Psychology and Industrial Efficiency" নামে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার" বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের বিবরণ দেন। Elton Mayo অন্য এক ব্যক্তিত্ব যিনি হর্থন গবেষণা (Hawthorne studies) এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯২৩-১৯৩২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শিকাগো শহরের ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরিতে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণায় বৈজ্ঞানিকভাবে বেশি আলো ও উৎপাদনশীলতা এর মধ্যে প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং এতে ২০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এখানে বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো উৎপাদনশীলতায় 'শ্রমিকদের আবেগময় উপাদান পারিপার্শ্বিক উপাদানের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। এ থেকে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সাড়া জাগে যে, শ্রমিকদের মানবীয় উপাদানের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

হর্থন গবেষণা

Hawthorne Study

গবেষণার স্থান: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলটন মেয়ো অস্ট্রেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক উপাদান এবং শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মেয়ো হার্ভার্ডে শিল্পগবেষণা বিভাগে পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এই কর্মসূচিটি ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন কারখানায় অনুসন্ধানের ফলে শুরু হয়। এই কর্মসূচি রকফেলার ফাইন্ডেশনের অর্থানুকূলে তারতম্যমূলক পরিস্থিতিতে একটা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপর আলোর প্রভাব কীরূপ তা এ ক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়। ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এই গবেষণা কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরীক্ষামূলক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যখন আলো বৃদ্ধি করা হয় তখন উৎপাদনও বেড়ে যায় এবং অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত দলের বেলায় আলো বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো হ্রাস করা

সত্ত্বেও উভয় দলের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এমনকি পরীক্ষিত দলের বেলায় আলোর পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করা হলেও উৎপাদন একই রকমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছয়টি মেয়ে একটা দল ১৯২৭ সালে দ্রব্য প্রস্তুত করার বিশেষ এক পেশা জীবনবৃত্তি হিসাবে বেছে নেয়। তাদের কারখানায় উৎপাদনের উপর প্রভাব পরীক্ষার জন্য কর্মপরিবেশের কিছতা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো ছিল বিভিন্ন সময় ও মেয়াদভিত্তিক অবসর, সংক্ষিপ্ত কর্মসপ্তাহ, সকালে নাস্তা খাওয়ার অবসরে কফি বা স্যুপ ইত্যাদি প্রদান। প্রতিটি পরিবর্তনের ফলাফল ছিল সংগতিপূর্ণ, এতে উৎপাদন বেড়ে যায় এবং একই সঙ্গে মেয়েরা কম ক্লান্তিবোধ করে। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এলটন মেয়ো শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কের উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ফলাফল: তার ধারণা হলো, কর্মীর আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক দলে শ্রমিকের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট উপাদান। সুতরাং মেয়ো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কর্মী ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন ছাড়াও কর্মস্থলে কর্মীদের সামাজিক সন্তুষ্টি বিধানের মনোচাহিদাও অবশ্যই পূরণ করা। মানবসম্পর্কের উপর এই নতুন গুরুত্ব আরোপের ফলে কারখানা অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও এক সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করে। The human problems of an industrial civilization নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উপসংহার: এলটন মেয়োও তার সহকর্মীগণ বিশ বছর ধরে কারখানার পরিবেশ নিয়ে যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন, তা ছিল একদল শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক গবেষণা। তারা লক্ষ্য করেন যে, কারখানায় শ্রমিকগণ এক ধরনের সংহতি বা পরিবেশ গড়ে তোলে, যা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত কাজ একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের সামাজিক সন্তুষ্টি বিধান করবে, অন্যদিকে কোম্পানির উপাদন চাহিদাও পূরণ করবে। এইভাবে কর্মীর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এলটন মেয়ো বলেন যে, কর্মীর সঙ্গে আচরণ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। একে অবশ্যই নতুন কর্তৃত্বের ধারণা এবং আদেশ করার অধিকার অর্জন করতে হবে এবং অবশ্যই ব্যক্তির সহযোগিতামূলক দুষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বিত সংগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ দলীয়কার্যসম্পাদনে কী কী উপাদান প্রভাব বিস্তার করে তা নির্ধারণপূর্বক খাতায় লিখবেন। হথর্ন গবেষণা সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

দলীয় কার্যসম্পাদনে চারটি উপাদান খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে, যেমন: গঠন, আকার, একত্রাবস্থান ও নীতি-আদর্শ। এগুলো পৃথকভাবে কার্যসম্পাদনের উপর প্রভাব ফেলে। এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্যসম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়াসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোর দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়মকানুন বা মান ভালো কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলটন মেয়ো অস্ট্রেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক উপাদান এবং শিল্পসংক্রান্ত

বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। **১৯২৭** সাল থেকে **১৯৪৭** সাল পর্যন্ত মেয়ো হার্ভার্ডে শিল্পগবেষণা বিভাগে পরীক্ষা-নিরিক্ষা পরিচালনা করেন। এই কর্মসূচিটি ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন কারখানায় অনুসন্ধানের ফলে শুরু হয়। এই কর্মসূচি রকফেলার ফাইন্ডেশনের অর্থানুকূলে তারতম্যমূলক পরিস্থিতিতে একটা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপর আলোর প্রভাব কিরূপ তা এ ক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়। ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এই গবেষণা কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরীক্ষামূলক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যখন আলো বৃদ্ধি করা হয় তখন উৎপাদনও বেড়ে যায় এবং অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত দলের বেলায় আলো বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো হ্রাস করা সত্ত্বেও উভয় দলের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এমনকি পরীক্ষিত দলের বেলায় আলোর পরিমাণ নূন্যতম পর্যায়ে হ্রাস করা হলেও উৎপাদন একই রকমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছয়টি মেয়ে একটা দল **১৯২৭** সালে দ্রব্য প্রস্তুত করার বিশেষ এক পেশা জীবনবৃত্তি হিসাবে বেছে নেয়। তাদের কারখানায় উৎপাদনের উপর প্রভাব পরীক্ষার জন্য কর্মপরিবেশের কিছুতা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো ছিল বিভিন্ন সময় ও মেয়াদভিত্তিক অবসর, সংক্ষিপ্ত কর্মসপ্তাহ, সকালে নাস্তা খাওয়ার অবসরে কফি বা স্যুপ ইত্যাদি প্রদান। প্রতিটি পরিবর্তনের ফলাফল ছিল সঙ্গতিপূর্ণ এতে উৎপাদন বেড়ে যায় এবং একই সঙ্গে মেয়েরা কম ক্লান্তিবোধ করে। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এলটন মেয়ো শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কের উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ব কাকে বলে? এর অনুমিত শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
২. নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের গঠণমূলক সমালোচনা উপস্থাপন করুন।
৪. আচরণ কী? আচরণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. মানব আচরণের মৌলিক দিকসমূহ বর্ণনা করুন।
৬. ব্যক্তিক আচরণের নির্ধারকসমূহ আলোচনা করুন।
৭. আচরণের কারণ তত্ত্বের মৌলিক মডেলটি বর্ণনা করুন।
৮. একই কারণে মানুষের আচরণ ভিন্ন হয় কেন?
৯. কী কারণে মানবাচরণ একই ধরনের হয়?
১০. আচরণ পরিবর্তনের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
১১. কে লিউনের আচরণ মডেলটি চিত্র সহকারে বর্ণনা করুন।
১২. সাংগঠনিক আচরণের মৌলিক অ্যাপ্রোচসমূহ কী?
১৩. দল কী? দলের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
১৪. দলের সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১৫. দলের জীবনচক্র কী? দলের জীবনচক্রের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।
১৬. একজন সদস্য দলে কেন যোগ দেয়?
১৭. দলের দুর্বলতাসমূহ কী? দলকে কীভাবে কার্যকর করা যায়?
১৮. দলের প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৯. মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ কী?
২০. ফলাফলসহ হর্থন গবেষণা বর্ণনা করুন।
২১. দলীয় কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কী?

সহায়ক গ্রন্থ :

- Kathryn M. Bartol & David C. Martin, "Management", 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, Newyork, 1994.
- Stephen P. Robbins, "Organizational Behavior, (9thed), Prentice – Hall of India Ltd. New Delhi, 2000.